দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

জনেষু প্রগৃণৎস্বেবং পৃথুং পৃথুলবিক্রমম্ ।
তত্রোপজগ্মুর্মুনয়শ্চত্বারঃ সূর্যবর্চসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **জনেষু**—প্রজারা; **প্রগৃণৎসু**—যখন প্রার্থনা করছিল; **এবম্**—এইভাবে; **পৃথুম্**—পৃথু মহারাজকে; **পৃথুল**—অত্যন্ত; **বিক্রমম্**—শক্তিশালী; **তত্র**—সেখানে; **উপজগ্মুঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **মুনয়ঃ**—কুমারগণ; **চত্বারঃ**—চার; **সূর্য**—সূর্যের মতো; **বর্চসঃ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রজারা যখন এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী রাজা পৃথুর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী চারজন কুমার এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ২

তাংস্তু সিদ্ধেশ্বরান্ রাজা ব্যোম্নোঽবতরতোঽর্চিষা ।
লোকানপাপান্ কুর্বাণান্ সানুগোঽচষ্ট লক্ষিতান্ ॥ ২ ॥

তান্—তাঁদের; **তু**—কিন্তু; **সিদ্ধ-ঈশ্বরান্**—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; **রাজা**—রাজা; **ব্যোম্নঃ**—আকাশ থেকে; **অবতরতঃ**—অবতরণ করার সময়; **অর্চিষা**—তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা; **লোকান্**—গ্রহলোক-সমূহ; **অপাপান্**—নিষ্পাপ; **কুর্বাণান্**—করে; **স-অনুগঃ**—তাঁর অনুচরগণ সহ; **অচষ্ট**—চেনা যাচ্ছিল; **লক্ষিতান্**—তাঁদের দেখে।

অনুবাদ

সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর সেই চারজন কুমার গ্রহলোক-সমূহকে পবিত্র করে যখন আকাশ থেকে অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে, রাজা ও তাঁর অনুচরেরা তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

চার কুমারকে এখানে *সিদ্ধেশ্বরান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর'। যোগসিদ্ধি লাভের ফলে অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ইত্যাদি আট প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। এই চার কুমারেরা সিদ্ধেশ্বররূপে সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং তাই তাঁরা কোন রকম যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীতই অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারতেন। তাঁরা যখন অন্য লোক থেকে পৃথু মহারাজের কাছে আসছিলেন, তখন তাঁরা বিমানে চড়ে আসেননি, পক্ষান্তরে স্বয়ং এসেছিলেন। অর্থাৎ, এই চতুঃসন যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত অন্তরীক্ষ-ভ্রমণে সক্ষম আকাশচারী ছিলেন। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা অন্তরীক্ষ যান ব্যতীত এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করতে পারেন। কুমারদের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেই স্থানকেই তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত করে পবিত্র করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে, এই ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত বস্তু নিষ্পাপ হয়েছিল, এবং তাই কুমারেরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করেছিলেন। যেই স্থান পাপপূর্ণ, সেই স্থানে তাঁরা সাধারণত যান না।

শ্লোক ৩

তদ্দর্শনোদ্গতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎসুরিবোত্থিতঃ ।
সসদস্যানুগো বৈণ্য ইন্দ্রিয়েশো গুণানিব ॥ ৩ ॥

তৎ—তাঁকে; **দর্শন**—দর্শন করে; **উদ্গতান্**—উদ্গ্রীব হয়েছিলেন; **প্রাণান্**—প্রাণ; **প্রত্যাদিৎসুঃ**—শান্তিপূর্ণভাবে গিয়ে; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **স**—সহ; **সদস্য**—পার্ষদ ও অনুচর; **অনুগঃ**—কর্মচারীগণ; **বৈণ্যঃ**—মহারাজ পৃথু; **ইন্দ্রিয়-ঈশঃ**—জীব; **গুণান্ ইব**—যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অনুবাদ

চার কুমারদের দর্শন করে, পৃথু মহারাজ তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর অমাত্যগণ সহ উত্থিত

হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

প্রতিটি বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের বিশেষ মিশ্রণের দ্বারা প্রভাবিত। তার ফলে, বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে, বিশেষভাবে কার্য করতে বাধ্য হয়। এখানে পৃথু মহারাজকে এই প্রকার বদ্ধ জীবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার কারণ এই নয় যে, তিনি ছিলেন বদ্ধ জীবাত্মা। চতুঃসনদের স্বাগত জানাবার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠাকে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তার চক্ষু সুন্দর রূপ দর্শন করতে চায়, তার কর্ণ সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণ করতে চায়, তার নাসিকা সুন্দর ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করতে চায়, তার ত্বক স্পর্শসুখ অনুভব করতে চায় এবং তার জিহ্বা সুন্দর স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। তেমনই হস্ত, পদ, উদর, উপস্থ, মন ইত্যাদি তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, সে কিছুতেই তাদের দমন করতে পারে না। তেমনই, পৃথু মহারাজও দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত চতুঃসনদের আকর্ষণে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং কেবল তিনিই নন, তাঁর অমাত্য ও অনুচরেরাও তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলা হয়, "সমরুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একসঙ্গে থাকেন।" এই পৃথিবীতে সকলেই তাদের নিজেদের মতো রুচিসম্পন্ন মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মদ্যপের প্রতি মদ্যপই আকৃষ্ট হয়। তেমনই, সাধুদের দ্বারা সাধু আকৃষ্ট হয়। পৃথু মহারাজ পারমার্থিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি কুমারদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁরই মতো সমরুচি-বিশিষ্ট। তাই বলা হয়, মানুষকে চেনা যায় তার সঙ্গ থেকে।

শ্লোক ৪

গৌরবাদ্যন্ত্রিতঃ সভ্যঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ ।
বিধিবৎপূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধ্যর্হণাসনান্ ॥ ৪ ॥

গৌরবাৎ—মহিমা; **যন্ত্রিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **সভ্যঃ**—অত্যন্ত সুশীল; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের দ্বারা; **আনত-কন্ধরঃ**—স্কন্ধ অবনত করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে; **পূজয়াম্**—আরাধনা করে; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **অধি**—সহ; **অর্হণ**—স্বাগত জানাবার উপচার; **আসনান্**—আসন সমূহ।

অনুবাদ

যখন সেই মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা স্বীকার করে, রাজার দেওয়া আসন গ্রহণ করলেন, তখন মহারাজ পৃথু তাঁদের গৌরবের বশীভূত হয়ে, বিনয়াবনত মস্তকে তাঁদের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই চারজন কুমারেরা হচ্ছেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম্পরা আচার্য। ব্রহ্ম, শ্রী, কুমার ও রুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমার সম্প্রদায় আসছে এই চার কুমার থেকে। তাই পৃথু মহারাজ সম্প্রদায়-আচার্যদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈঃ*—শ্রীগুরুদেব অথবা সম্প্রদায়ের আচার্যকে ঠিক ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করা উচিত। এই শ্লোকে *বিধিবৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ পৃথু মহারাজ নিষ্ঠা সহকারে সৎ সম্প্রদায়ের আচার্য বা গুরুদেবকে স্বাগত জানাবার জন্য শাস্ত্রবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। আচার্যকে দর্শন করা মাত্রই তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত। পৃথু মহারাজ তা যথাযথভাবে করেছিলেন; তাই এখানে *প্রশ্রয়ানত-কন্ধরঃ* শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। বিনয়বশত তিনি কুমারদের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জিতালকবন্ধনঃ ।
তত্র শীলবতাং বৃত্তমাচরন্মানয়ন্নিব ॥ ৫ ॥

তৎ-পাদ—তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম; **শৌচ**—ধৌত; **সলিলৈঃ**—জল; **মার্জিত**—ছিটিয়েছিলেন; **অলক**—চুল; **বন্ধনঃ**—গুচ্ছ; **তত্র**—সেখানে; **শীলবতাম্**—সম্মানিত ব্যক্তিদের; **বৃত্তম্**—আচরণ; **আচরন্**—আচরণ করেছিলেন; **মানয়ন্**—অনুশীলন করে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

তারপর রাজা কুমারদের পাদোদক তাঁর নিজের মস্তকে সিঞ্চন করেছিলেন। এই প্রকার শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কিভাবে একজন মহাত্মাকে সম্মান করতে হয়, তা রাজা একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়* । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন আচার্যরূপে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা তিনি নিজে আচরণও করেছেন, সেই কথা সুবিদিত। তিনি যখন ভক্তরূপে ভগবানের মহিমা প্রচার করছিলেন, তখন যদিও কয়েকজন মহান ব্যক্তি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিনতে পেরেছিলেন, তবুও কখনও তাঁকে অবতার বলে সম্বোধন করলে, তিনি তা স্বীকার করেননি। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের অবতার হন অথবা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট হন, তবুও নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করা তাঁর উচিত নয়। যথাসময়ে মানুষ আপনা থেকেই প্রকৃত সত্য জানতে পারবে। পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব রাজা; তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে কুমারদের মতো মহাপুরুষদের সম্মান করতে হয়। কোন সাধু যখন গৃহে আসেন, বৈদিক প্রথায় প্রথমে তাঁর পা ধোয়ানো হয় এবং সেই পাদোদক নিজের মাথায় ও পরিবারের অন্যদের মাথায় ছিটানো হয়। পৃথু মহারাজ তা করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন জনসাধারণের একজন আদর্শ শিক্ষক।

শ্লোক ৬

হাটকাসন আসীনান্ স্বধিষ্ণ্যেষ্বিব পাবকান্ ।
শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ প্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥ ৬ ॥

হাটক-আসনে—স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে; **আসীনান্**—যখন তাঁরা উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যেষু**—পূজার বেদির উপর; **ইব**—সদৃশ; **পাবকান্**—অগ্নি; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **সংযম**—সংযম; **সংযুক্তঃ**—অলংকৃত হয়ে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ভব**—শিব; **অগ্রজান্**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের।

অনুবাদ

সেই চারজন মহর্ষি ছিলেন শিবের অগ্রজ, এবং তাঁরা যখন স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন তাঁরা যজ্ঞবেদিতে ঠিক জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত

হচ্ছিলেন। পৃথু মহারাজ গভীর নম্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে অত্যন্ত সংযতভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কুমারদের শিবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে যখন কুমারদের উৎপত্তি হয়েছিল, তখন ব্রহ্মা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের বিবাহ করতে বলেছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যকতা ছিল; তাই ব্রহ্মা একের পর এক পুত্র উৎপাদন করছিলেন এবং তাঁদের প্রজাসৃষ্টির আদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু, তিনি যখন কুমারদের তা করতে বলেন, তখন তাঁরা সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কুমারদের বলা হয় *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী,* অর্থাৎ তাঁরা কখনও বিবাহ করবেন না। বিবাহ করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মা তাঁদের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চক্ষু আরক্তিম হয়েছিল। তখন তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে শিব বা রুদ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। ক্রোধকে তাই বলা হয় রুদ্র। শিবেরও একটি সম্প্রদায় রয়েছে, এবং সেটি রুদ্র-সম্প্রদায় নামে পরিচিত, এবং তাঁরাও বৈষ্ণব।

শ্লোক ৭

পৃথুরুবাচ

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥ ৭ ॥

পৃথুঃ উবাচ—মহারাজ পৃথু বললেন; **অহো**—হে প্রভু; **আচরিতম্**—অনুশীলন; **কিম্**—কি; **মে**—আমার দ্বারা; **মঙ্গলম্**—সৌভাগ্য; **মঙ্গল-আয়নাঃ**—হে সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ; **যস্য**—যার দ্বারা; **বঃ**—আপনার; **দর্শনম্**—দর্শন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আসীৎ**—সম্ভব হয়েছে; **দুর্দর্শানাম্**—দুর্লভ দর্শন; **চ**—ও; **যোগিভিঃ**—মহান যোগীদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পৃথু বললেন—হে প্রিয় মহর্ষিগণ! আপনারা সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের দর্শন যোগীদেরও দুর্লভ। মানুষ কদাচিৎ আপনাদের দর্শন করতে

পারে। আমি জানি না এমন কি শুভ কার্য আমি করেছিলাম, যার ফলে আমি আপনাদের দর্শন পেলাম।

তাৎপর্য

যখন কারও পারমার্থিক জীবনে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটে, তখন বুঝতে হবে যে, তা তাঁর অজ্ঞাত সুকৃতি বা অজ্ঞাত পুণ্যকর্মের ফল। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দর্শন কোন সাধারণ ঘটনা নয়। যখন তা ঘটে, তখন বুঝতে হবে যে, তা পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের পরিণাম। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্* । কেউ যখন সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুণ্যকর্মে মগ্ন হন, তখনই কেবল তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন। পৃথু মহারাজের জীবন যদিও পুণ্যকর্মে পূর্ণ ছিল, তবুও তিনি কুমারদের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তিনি ভেবে পাননি, কি পুণ্যকর্ম তিনি করেছিলেন। এটি পৃথু মহারাজের বিনয়ের লক্ষণ। তাঁর জীবন এমনই পুণ্য কার্যকলাপে পূর্ণ ছিল যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কুমারেরাও আসবেন।

শ্লোক ৮

কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ ।
যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ ॥ ৮ ॥

কিম্—কি; **তস্য**—তাঁর; **দুর্লভ-তরম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **ইহ**—এই; **লোকে**—জগতে; **পরত্র**—মৃত্যুর পর; **চ**—অথবা; **যস্য**—যাঁর; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হন; **শিবঃ**—সর্ব-মঙ্গলময়; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—ও; **স-অনুগঃ**—সহগামী।

অনুবাদ

যাঁর উপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ যে-কোন বস্তু প্রাপ্ত হতে পারেন। কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকেন যে সর্ব-মঙ্গলময় শিব ও বিষ্ণু, তাঁরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা সর্ব-মঙ্গলময় ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বহন করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের প্রতি তাঁদের গভীর প্রেমবশত সর্বদা তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে বহন করেন। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতপক্ষে ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁকে সর্বদাই অনুভব করেন এবং দর্শন করেন। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে বহন করেন। যেখানেই তাঁরা যান, শ্রীবিষ্ণু, শিব ও ভগবদ্ভক্তদের তাঁরা বহন করেন। চার কুমার হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, এবং তাঁরা মহারাজ পৃথুর প্রাসাদে এসেছিলেন, অতএব স্বভাবতই শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর ভক্তরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও সেই কথা প্রতিপন্ন করে *গুর্বাষ্টকমে* গেয়েছেন—*যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদঃ* । ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর প্রসন্নতা-বিধানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে আর ইহলোকে অথবা পরলোকে তাঁর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

শ্লোক ৯

নৈব লক্ষয়তে লোকো লোকান্ পর্যটতোঽপি যান্ ।
যথা সর্বদৃশং সর্ব আত্মানং যেঽস্য হেতবঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; **এব**—এইভাবে; **লক্ষয়তে**—দেখতে পারে; **লোকঃ**—লোকজন; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **পর্যটতঃ**—ভ্রমণ করে; **অপি**—যদিও; **যান্**—যাঁদের; **যথা**—যেমন; **সর্ব-দৃশম্**—পরমাত্মা; **সর্বে**—সকলের মধ্যে; **আত্মানম্**—সকলের অন্তরে; **যে**—যারা; **অস্য**—এই জগতের; **হেতবঃ**—কারণ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউই আপনাদের দেখতে পায় না, ঠিক যেমন সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজ

করলেও পরমাত্মাকে কেউই জানতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও পরমাত্মাকে জানতে পারেন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বলা হয়েছে—*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ* । ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও চন্দ্র আদি দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে মোহিত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রও তাঁকে চিনতে পারেননি। অতএব যে-সমস্ত যোগী অথবা জ্ঞানীরা, যারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, তাদের আর কি কথা? তেমনই, কুমারদের মতো মহাপুরুষ এবং বৈষ্ণবেরাও সাধারণের দৃষ্টির অগোচর, যদিও তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে সর্বত্র বিচরণ করেন। সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর আচার্য তাঁকে চিনতে পারেননি। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করলেও যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন ব্যক্তিরা এই জগতের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, তেমনই, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবেরাও পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করলেও, বদ্ধ জীবেরা তাঁদের চিনতে পারে না। তাই বলা হয়েছে যে, জড় চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান অথবা বৈষ্ণবকে দর্শন করা যায় না। ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করতে হয়, তখন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা যায় পরমেশ্বর ভগবান কে এবং বৈষ্ণব কে।

শ্লোক ১০

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্যাম্বুতৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ১০ ॥

অধনাঃ—নির্ধন; **অপি**—যদি; **তে**—তারা; **ধন্যাঃ**—মহিমান্বিত; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **গৃহ-মেধিনঃ**—গৃহাসক্ত ব্যক্তি; **যৎ-গৃহাঃ**—যার গৃহ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্হবর্য**—অত্যন্ত পূজনীয়; **অম্বু**—জল; **তৃণ**—ঘাস; **ভূমি**—ভূমি; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **অবরাঃ**—ভৃত্য।

অনুবাদ

গৃহাসক্ত ব্যক্তি যদি নির্ধনও হন, তবুও তাঁর গৃহে সাধু সমাগম হলে তিনি ধন্য হন। সেই গৃহস্বামী ও তাঁর সেবক সেই মহান অতিথিকে জল, আসন ও স্বাগত জানাবার সামগ্রী প্রদান করে ধন্য হন, এবং সেই গৃহও ধন্য হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক বিচারে নির্ধন ব্যক্তি ব্যর্থ, এবং পারমার্থিক বিচারে যে ব্যক্তি সংসার জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে-ও ব্যর্থ। কিন্তু সাধু নির্ধন অথবা গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের গৃহে যাওয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। যখন তা হয়, তখন গৃহস্বামী ও তাঁর ভৃত্যরা ধন্য হন, কারণ তাঁরা তাঁর পা ধোয়ার জল প্রদান করেন, তাঁর বসার জন্য আসন দান করেন এবং তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী প্রদান করেন। অতএব সাধু যখন কোন সাধারণ মানুষের গৃহেও যান, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদের প্রভাবে ধন্য হন। তাই বৈদিক প্রথায় সাধুদের আশীর্বাদ লাভের জন্য গৃহস্থরা তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রথা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রয়েছে, এবং তাই সাধুরা যেখানেই যান, গৃহস্থরা তাঁদের সৎকার করেন, এবং প্রতিদানে তাঁরা তাঁদের দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। তাই সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞ গৃহস্থদের অনুগ্রহ করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করা।

কেউ তর্ক করতে পারে যে, সমস্ত গৃহস্থরাই ধনী নন এবং তাই তাঁদের পক্ষে বড় বড় সাধুদের সৎকার করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের সঙ্গে তাঁদের শিষ্যরাও থাকেন। গৃহস্থ যদি সাধুর সৎকার করতে চান, তা হলে তাঁর অনুগামীদেরও সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দুর্বাসা মুনি সর্বদা তাঁর ষাট হাজার শিষ্যসহ ভ্রমণ করতেন এবং যদি আতিথ্যে একটুও ত্রুটি হত, তা হলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন এবং কখনও কখনও গৃহস্বামীকে অভিশাপ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন গৃহস্থ, তা তিনি যতই দরিদ্র হোন না কেন, ভক্তিপূর্বক সাধুকে সম্মান করতে পারেন, এবং অন্তত একটু জল দিতে পারেন, কারণ পানীয় জল সর্বত্রই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গৃহে যদি হঠাৎ কোন অতিথি আসেন এবং তাঁকে যদি আহার্য সামগ্রী না দেওয়া যায়, তা হলে অন্ততপক্ষে তাঁকে এক গ্লাস জল দিতে হয়। জলও যদি না থাকে, তা হলে অন্তত বসার আসন দেওয়া যায়। আর যদি আসনও না থাকে, তা হলে অন্তত ভূমি পরিষ্কার করে, সেখানে অতিথিকে বসতে অনুরোধ করা যায়। কোন গৃহস্থ যদি তাও না করতে পারেন, তা হলে অন্তত হাত জোড় করে *'স্বাগতম্'* বলে অতিথিকে অভিনন্দন জানাতে পারেন। তাও যদি না করা যায়, তা হলে নিজের দরিদ্র অবস্থার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, অশ্রু-বিসর্জন করা যায় এবং স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা যায়। এইভাবে যে-কোন অতিথিকে, তা তিনি সাধু মহাত্মাই হোন অথবা রাজা হোন, সৎকার করে তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায়।

শ্লোক ১১

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেষ্বরিক্তাখিলসম্পদঃ ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাল—বিষধর সর্প; **আলয়**—গৃহ; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষ; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **তেষু**—সেই গৃহে; **অরিক্ত**—পর্যাপ্তভাবে; **অখিল**—সমস্ত; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য; **যৎ**—যা; **গৃহাঃ**—গৃহ; **তীর্থ-পাদীয়**—মহাপুরুষদের চরণ সম্বন্ধীয়; **পাদ-তীর্থ**—পাদোদক; **বিবর্জিতাঃ**—বিহীন।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, যে গৃহস্থের গৃহে ভগবানের ভক্তের চরণ পড়ে না, এবং যেখানে সেই চরণ ধোয়ার জল থাকে না, সেই গৃহ যদি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং জাগতিক উন্নতিতে পরিপূর্ণও হয়, তবুও তা বিষধর সর্পসঙ্কুল বৃক্ষের মতো।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তীর্থপাদীয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব। পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রাহ্মণদের কিভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, এই শ্লোকে, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। সাধারণত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী দুই প্রকার—একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী। একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা সাধারণত শঙ্করাচার্যের অনুগামী এবং তাদের বলা হয় মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কিন্তু ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরা রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য আদি বৈষ্ণব আচার্যদের অনুগামী, এবং তাঁরা গৃহস্থদের জ্ঞান প্রদানের কার্যে ব্যস্ত। একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা শুদ্ধ ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, কারণ তাঁরা জানেন যে, চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা সাধারণত নির্বিশেষবাদী। বৈষ্ণবেরা জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং ব্রহ্মজ্যোতি তাঁরই দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা, যে-কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (১৪/২৭)—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* । অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, *তীর্থপাদীয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বৈষ্ণব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—*তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি* । বৈষ্ণব যেখানেই যান, সেই স্থানকে তিনি তীর্থস্থানে পরিণত করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তাঁদের পাদপদ্মের স্পর্শের দ্বারা প্রতিটি স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা

অনুসারে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেই গৃহ বৈষ্ণবদের অভ্যর্থনা জানায় না, সেই গৃহ বিষধর সর্পের বাসস্থান-স্বরূপ। বলা হয় যে, অত্যন্ত মূল্যবান চন্দন গাছের চারপাশে বিষধর সর্পেরা থাকে। চন্দন কাঠ অত্যন্ত শীতল, এবং বিষধর সর্পরা তাদের বিষের প্রভাবে সর্বদাই অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং তাই শীতল হওয়ার জন্য তারা চন্দন-বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে। তেমনই বহু ধনী ব্যক্তি আছে যাদের ঘর বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর থাকে অথবা প্রহরী থাকে, এবং তাদের ফটকে অনেক সময় ফলকে লেখা থাকে 'প্রবেশ নিষেধ', 'অনধিকার প্রবেশ নিষেধ', 'কুকুর থেকে সাবধান' ইত্যাদি। কখনও কখনও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অনধিকার প্রবেশকারীকে গুলি করা হয়, এবং তার ফলে কোন অপরাধ হয় না। আসুরিক গৃহস্থদের এমনই অবস্থা, এবং সেই প্রকার গৃহকে বিষধর সর্পের বাসস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। এই প্রকার পরিবারের সদস্যরা সর্পতুল্য কারণ সাপেরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, এবং তারা যখন সাধুদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, তখন তাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, ক্রূর দুই প্রকার—সর্প ও খল ব্যক্তি। খল ব্যক্তি সর্পের থেকেও ভয়ঙ্কর, কারণ সর্পকে মন্ত্রের দ্বারা অথবা ওষুধের দ্বারা বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল ব্যক্তিকে কোনভাবেই বশীভূত করা যায় না।

শ্লোক ১২

স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদ্‌ব্রতানি মুমুক্ষবঃ ।
চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি চ ॥ ১২ ॥

সু-আগতম্—স্বাগত; **বঃ**—আপনাদেরকে; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যাঁর; **ব্রতানি**—ব্রত; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তির; **চরন্তি**—আচরণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাপূর্বক; **ধীরাঃ**—সংযত; **বালাঃ**—বালক; **এব**—সদৃশ; **বৃহন্তি**—দর্শন করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ চতুঃসনদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনারা আপনাদের জন্ম থেকেই নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন, এবং যদিও আপনারা মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তবুও আপনারা ছোট বালকের মতো রয়েছেন।

তাৎপর্য

কুমারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁদের জন্ম থেকেই তাঁরা ব্রহ্মচারী। তাঁরা নিজেদের চার-পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুর মতো রেখেছেন, কারণ যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হলে, কখনও কখনও ইন্দ্রিয় বিচলিত হয় এবং তার ফলে ব্রহ্মচর্য পালন করা দুষ্কর হতে পারে। তাই কুমারেরা জেনেশুনে শিশুর মতো রয়েছেন, কারণ শিশুদের ইন্দ্রিয় কখনও যৌন বাসনার দ্বারা বিচলিত হয় না। সেটিই হচ্ছে কুমারদের মাহাত্ম্য, এবং তাই পৃথু মহারাজ তাঁদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেছেন। কুমারেরা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা থেকে জন্মগ্রহণই করেননি, তাঁদের এখানে *দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, তাঁদের প্রবর্তিত একটি সম্প্রদায় রয়েছে, এবং আজও সেই সম্প্রদায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায় নামে প্রচলিত রয়েছে। বৈষ্ণব আচার্যদের চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় একটি। পৃথু মহারাজ বিশেষভাবে কুমারদের স্থিতির প্রশংসা করেছেন, কারণ তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই তাঁরা ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করেছেন। পৃথু মহারাজ কুমারদের বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে বৈষ্ণবত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সকলের কর্তব্য হচ্ছে বৈষ্ণবের জাতি, কুল ইত্যাদি বিচার না করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। *বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ* করা উচিত নয়। বৈষ্ণব সর্বদাই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, এবং তাই বৈষ্ণবকে কেবল ব্রাহ্মণরূপে নয়, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠরূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১৩

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্ ।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্মভিঃ ॥ ১৩ ॥

কচ্চিৎ—কি; **নঃ**—আমাদের; **কুশলম্**—সৌভাগ্য; **নাথাঃ**—হে প্রভু; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করাকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে; **অর্থ-বেদিনাম্**—যারা কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন সম্বন্ধেই অবগত; **ব্যসন**—অসুখ; **আবাপে**—প্রাপ্ত হয়েছে; **এতস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পতিতানাম্**—পতিতদের; **স্ব-কর্মভিঃ**—তাদের নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ ঋষিদের কাছে সেই প্রকার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে, এই ভয়ঙ্কর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি কোন রকম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ কুমারদের কুশল প্রশ্ন করেননি, কারণ ব্রহ্মচর্যের জীবন যাপন করার ফলে, তাঁরা সর্বদাই মঙ্গলময়। যেহেতু তাঁরা মুক্তির ব্রত আচরণ করেন, তাই তাঁদের কোন প্রকার দুর্ভাগ্যের প্রশ্নই উঠতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠা সহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পন্থা অনুসরণ করছেন যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ, তাঁরা সর্বদাই সৌভাগ্যবান। যে প্রশ্নটি মহারাজ করেছিলেন, তা ছিল তাঁর নিজের জন্য, কারণ তিনি রাজকার্যের দায়িত্বে ছিলেন এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলেন। রাজারা কেবল গৃহস্থই নন, উপরন্তু তাঁরা সাধারণত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে মগ্ন থাকেন, এবং কখনও কখনও তাঁদের মৃগয়ায় গিয়ে পশুহত্যা করতে হয়, কারণ হত্যা করার কলা তাঁদের অভ্যাস করতে হয়, তা না হলে তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হবে। স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, আসবপান ও দ্যূতক্রীড়া—এই চারটি পাপকর্ম ক্ষত্রিয়দের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন পাণ্ডবেরা। দুর্যোধন যখন পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেছিল, তখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি, এবং সেই দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের রাজ্য তাঁরা হারিয়েছিলেন, এবং তাঁদের পত্নীকে অপমান করা হয়েছিল। তেমনই, শত্রুপক্ষ যখন ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন ক্ষত্রিয় তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সেই সমস্ত কথা বিচার করে পৃথু মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের জন্য কোন মঙ্গলময় পথ রয়েছে কি না। গৃহস্থ-জীবন অমঙ্গলজনক, কারণ গৃহস্থ মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেতনা, এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে লিপ্ত হওয়া মাত্রই জীবন বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। এই জড় জগৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে *পদং পদং যদ্‌বিপদাং ন তেষাম্*, প্রতি পদে বিপদ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৫৮)। এই জড় জগতে সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। সেই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ করে, চতুঃসনদের নিকট মহারাজ পৃথু সেই সমস্ত পতিত জীবদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যারা পূর্বকৃত পাপকর্ম অথবা অমঙ্গলজনক কর্মের ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাদের কি মঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন লাভের কোন সম্ভাবনা রয়েছে? এই শ্লোকে *ইন্দ্রিয়ার্থার্থ-বেদিনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, এই শব্দটির দ্বারা তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের *পতিতানাম্* বা অধঃপতিত বলেও বর্ণনা

করা হয়েছে। যাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *স্ব-কর্মভিঃ* । মানুষ তার পূর্বকৃত অসৎ কর্মের ফলে অধঃপতিত হয়। মানুষ তার অধঃপতিত অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী, কারণ তার অসৎ কর্মই হচ্ছে তার অধঃপতনের কারণ। সেই সমস্ত কর্মের পরিবর্তে যখন ভগবানের সেবা শুরু হয়, তখন মঙ্গলময় জীবন শুরু হয়।

শ্লোক ১৪

ভবৎসু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে ।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ভবৎসু—আপনাদেরকে; **কুশল**—সৌভাগ্য; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **আত্ম-আরামেষু**—যিনি সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন; **ন ঈষ্যতে**—কোন প্রয়োজন নেই; **কুশল**—সৌভাগ্য; **অকুশলাঃ**—অমঙ্গল; **যত্র**—যেখানে; **ন**—কখনই না; **সন্তি**—থাকে; **মতি-বৃত্তয়ঃ**—মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—আপনারা সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাই আপনাদের কুশল অথবা অকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনোধর্ম-প্রসূত শুভ ও অশুভ আপনাদের মধ্যে নেই।

তাৎপর্য

চৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব —'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

এই জড় জগতে ভাল ও মন্দ উভয়ই মনোধর্ম-প্রসূত, কারণ জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তার প্রকাশ হয়। তাকে বলা হয় মায়া বা *আত্ম-মায়া* । স্বপ্নে অনেক কিছুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়, তেমনই আমরা মনে করি যে, জড়া প্রকৃতি থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। চিন্ময় আত্মা কিন্তু সর্বদাই জড়াতীত। আত্মার জড়া প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই আবরণ স্বপ্ন

অথবা সম্মোহনের মতো। *ভগবদ্গীতাতেও* (২/৬২) বলা হয়েছে, *সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ* । সঙ্গ প্রভাবে আমরা কৃত্রিম জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি সৃষ্টি করি। *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে* । আমরা যখন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হই এবং জড় জগৎকে ভোগ করতে চাই, তখন আমাদের জড় বাসনাগুলি প্রকট হয়, এবং আমরা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখের সঙ্গলাভ করি। জড় ভোগবাসনা উদয় হওয়া মাত্রই, বিভিন্ন প্রকার কামভোগের বাসনা সৃষ্টি হয়, এবং সেই ভ্রান্ত ভোগবাসনা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুখী করতে পারে না, তখন ক্রোধ নামক আর এক প্রকার মোহের সৃষ্টি হয়, এবং ক্রোধের ফলে মোহ দৃঢ়তর হয়। এইভাবে যখন আমরা মোহাচ্ছন্ন হই, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আমরা ভুলে যাই, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত হারাবার ফলে, আমাদের প্রকৃত বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। এইভাবে আমরা এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি।

ভগবদ্গীতায় (২/৬৩) বলা হয়েছে—

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

জড় জগতের সঙ্গ প্রভাবে আমরা আমাদের চিন্ময় চেতনা হারিয়ে ফেলি; এবং তার ফলে শুভ ও অশুভ ধারণার উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা আত্মারাম, তাঁদের এই প্রশ্ন ওঠে না। *আত্মারাম* ধীরে ধীরে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। প্রথমে কুমারেরা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি আকৃষ্ট হন। মূলকথা হচ্ছে যে, যাঁরা সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁদের কাছে শুভ ও অশুভের দ্বৈত ভাবনার উদয় হয় না। অতএব পৃথু মহারাজ কুমারদের কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি, তাঁর নিজের সম্বন্ধে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ সুহৃদো বস্তপস্বিনাম্ ।
সংপৃচ্ছে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঞ্জসা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **কৃত-বিশ্রম্ভঃ**—সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে; **সু-হৃদঃ**—বন্ধু; **বঃ**—আমাদের; **তপস্বিনাম্**—জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **সম্পৃচ্ছে**—প্রশ্ন

করতে ইচ্ছা করি; **ভবে**—এই জড় জগতে; **এতস্মিন্**—এই; **ক্ষেমঃ**—পরম বাস্তবতা; **কেন**—কোন্ উপায়ে; **অঞ্জসা**—অবিলম্বে; **ভবেৎ**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনাদের মতো মহর্ষিরা সংসাররূপী দাবানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র সুহৃৎ। তাই আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে আমরা অচিরে এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারি।

তাৎপর্য

সাধুরা যখন জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁরা তা করছেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিষয়ীদের কাছে যান, বাস্তবিক মঙ্গল সম্বন্ধে তাদের জানাবার জন্য। পৃথু মহারাজ তা পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন; তাই কুমারদের কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট না করার পরিবর্তে, তিনি অচিরে এই জড় জগতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবেন কি না, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পৃথু মহারাজও আবার নিজের জন্য সেই প্রশ্নটি করেননি, তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন, কেননা সাধারণ মানুষেরা যাতে সাধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই, তাঁদের শরণাগত হয়ে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার বেদনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁদের নিকট প্রশ্ন করে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়।* "আমরা নিরন্তর জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা জর্জরিত, আমাদের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের কোন চেষ্টা আমরা করিনি।" বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদেরও *তপস্বী* বলা যায়, কারণ সেই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা সর্বদা জড়-জাগতিক কষ্ট ভোগ করছে। কেউ যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই সমস্ত জড়-জাগতিক কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই কথারও বিশ্লেষণ করেছেন—*"গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেন তায়।"* নরোত্তম দাস ঠাকুর অনুশোচনা করে বলেছেন যে, গোলোকের সব চাইতে দুর্লভ সম্পদ যে হরিনাম সংকীর্তন, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের উদয় হল না। অর্থাৎ এই জড় জগতে সকলেই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, এবং কেউ যদি তা থেকে উদ্ধার লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাধু

মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে, এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে হবে। সেটিই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের মঙ্গল-সাধনের একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ১৬

ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ ।
স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যক্তম্—স্পষ্ট; **আত্ম-বতাম্**—অধ্যাত্মবাদীদের; **আত্মা**—জীবনের লক্ষ্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-ভাবনঃ**—জীবদের উন্নতিসাধনে সর্বদা উৎসুক; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের ভক্তদের; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ইমাম্**—এইভাবে; **সিদ্ধ-রূপী**—সম্পূর্ণরূপে স্বরূপসিদ্ধ; **চরতি**—ভ্রমণ করেন; **অজঃ**—নারায়ণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের উন্নতিসাধনে অত্যন্ত আগ্রহী, এবং তাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাদের মতো স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার পরমার্থবাদী রয়েছেন, যেমন জ্ঞানী বা ব্রহ্মবাদী, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত। কুমারেরা প্রথমে যোগী ও জ্ঞানী ছিলেন এবং অবশেষে তাঁরা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। আদিতে তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মবাদী, কিন্তু পরে তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হন; তাই তাঁরা হচ্ছেন পরমার্থবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং বদ্ধ জীবদের শুদ্ধ চেতনায় উন্নীত করার জন্য এবং তাদের কৃষ্ণভক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শ্রেষ্ঠ ভক্তদের বলা হয় *আত্মবৎ*, অথবা যাঁরা পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে তাদের কৃষ্ণচেতনার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছেন। তাই তাঁকে বলা হয় *আত্ম-ভাবন* । পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জীবদের বুদ্ধি প্রদান করার চেষ্টা করছেন, যাতে তারা তাঁকে জানতে পারে। তিনি সকলের সখারূপে তাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং প্রতিটি জীবকে তার বাসনা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

এই শ্লোকে *আত্মবতাম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা—*কনিষ্ঠ-অধিকারী, মধ্যম-অধিকারী* ও *উত্তম-অধিকারী*—নব্য ভক্ত, প্রচারক ভক্ত ও *মহা-ভাগবত*। *উত্তম-অধিকারী* ভক্তের বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে, তাই তিনি ভগবদ্ভক্ত হয়েছেন। তিনি নিজেই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ নন, অন্যদেরও বৈদিক শাস্ত্র-প্রমাণের মাধ্যমে তিনি প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেন। উত্তম ভক্ত সমস্ত জীবদের পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করতে পারেন, এবং তাই তাঁর দৃষ্টিতে কোন ভেদভাব থাকে না। *মধ্যম-অধিকারী* (প্রচারক) ভক্তও শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং অন্যদের প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারেন, কিন্তু তিনি অনুকূল-ভাবাপন্ন ও প্রতিকূল-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন। অর্থাৎ, *মধ্যম-অধিকারী* ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের উপেক্ষা করেন, এবং *কনিষ্ঠ-অধিকারী* ভক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব একটা না জানলেও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ। কুমারেরা কিন্তু ছিলেন *মহাভাগবত*, কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরমতত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর, তাঁরা ভগবদ্ভক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্ত অনেক রয়েছে, কিন্তু যে ভক্ত বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তিনি তাঁর সব চাইতে প্রিয়। সকলেই তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী উচ্চতম পদে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছে। দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ কর্মীরা পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। জ্ঞানীদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু ভক্তের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা। তাই ভক্তরা হচ্ছেন বাস্তবিকই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তাই তাঁরা প্রত্যক্ষ নারায়ণরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, কারণ তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে নারায়ণকে বহন করেন এবং তাঁর মহিমা প্রচার করেন। নারায়ণের প্রতিনিধি নারায়ণেরই মতো, কিন্তু তা বলে মায়াবাদীদের মতো কখনও নিজেকে নারায়ণ বলে মনে করা উচিত নয়। মায়াবাদীরা সাধারণত সন্ন্যাসীদের নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। তাদের ধারণা যে, কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে, মানুষ নারায়ণের সমতুল্য হয়ে যায় অথবা স্বয়ং নারায়ণ হয়ে যায়। বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন, এবং সেই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, ভগবদ্ভক্ত নিজে নারায়ণ হয়ে গিয়ে নারায়ণের সমতুল্য হন না, পক্ষান্তরে নারায়ণের পরম বিশ্বস্ত সেবকরূপে নারায়ণের সমতুল্য হন। এই প্রকার মহাত্মা জনসাধারণের মঙ্গল-সাধনের জন্য গুরুর কার্য করেন, এবং যেই গুরুদেব নারায়ণের মহিমা প্রচার করেন, তাঁকে নারায়ণ-সদৃশ বলে মনে করে সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

পৃথোস্তৎসূক্তমাকর্ণ্য সারং সুষ্ঠু মিতং মধু ।
স্ময়মান ইব প্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **তৎ**—তা; **সূক্তম্**—বৈদিক সিদ্ধান্ত; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সারম্**—অত্যন্ত সারগর্ভ; **সুষ্ঠু**—উপযুক্ত; **মিতম্**—পরিমিত; **মধু**—শ্রুতিমধুর; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হেসে; **ইব**—সদৃশ; **প্রীত্যা**—পরম প্রসন্নতাপূর্বক; **কুমারঃ**—ব্রহ্মচারী; **প্রত্যুবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **হ**—এইভাবে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের অত্যন্ত সারগর্ভ, উপযুক্ত, স্বল্পাক্ষর ও শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করে পরম প্রসন্নতা সহকারে ঈষৎ হেসে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কুমারদের কাছে পৃথু মহারাজ যে-কথা বলেছিলেন, তা অনেক গুণযুক্ত হওয়ার ফলে, অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। ভাষণ মনোনীত শব্দের দ্বারা রচিত হওয়া উচিত, এবং তা শ্রুতিমধুর পরিস্থিতির অনুকূল হওয়া উচিত। সেই প্রকার বাণীকে বলা হয় অর্থযুক্ত। পৃথু মহারাজের বাণীতে সেই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি উপস্থিত ছিল, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ ভক্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*—"যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২) তাই কুমারেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সনৎকুমার এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সনৎকুমার উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহারাজ সর্বভূতহিতাত্মনা ।
ভবতা বিদুষা চাপি সাধূনাং মতিরীদৃশী ॥ ১৮ ॥

সনৎ-কুমারঃ উবাচ—সনৎকুমার বললেন; **সাধু**—সাধু প্রকৃতির; **পৃষ্টম্**—প্রশ্ন; **মহারাজ**—হে রাজন্; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবদের; **হিত-আত্মনা**—যিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **বিদুষা**—অত্যন্ত বিদ্বান; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **ঈদৃশী**—এই প্রকার।

অনুবাদ

সনৎকুমার বললেন—হে পৃথু মহারাজ! আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই প্রকার প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ; বিশেষ করে সর্বদা অন্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার মতো ব্যক্তি তা উত্থাপন করেছেন। যদিও আপনি সব কিছু জানেন, তবুও আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটিই হচ্ছে সাধুদের আচরণ। এই প্রকার বুদ্ধি আপনার মতো ব্যক্তিরই উপযুক্ত।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ দিব্যজ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন, তবুও কুমারদের কাছে তিনি নিজেকে একজন মূর্খের মতো উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ যতই মহান ও বিজ্ঞ হোন না কেন, গুরুজনদের সম্মুখে তাঁর প্রশ্ন করা উচিত। যেমন, অর্জুন যদিও দিব্যজ্ঞান-সমন্বিত ছিলেন, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, যেন তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। তেমনই, পৃথু মহারাজও সব কিছু জানতেন, তবুও তিনি কুমারদের কাছে এমনভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, যেন তিনি কিছুই জানতেন না। মহান ব্যক্তিরা যখন পরমেশ্বর ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের কাছে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করা। তাই কখনও কখনও মহাপুরুষেরা জেনে শুনে উচ্চতর মহাজনদের কাছে প্রশ্ন করেন, কারণ তাঁরা সর্বদা অন্যের কল্যাণ চিন্তা করেন।

শ্লোক ১৯

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাং চ সম্মতঃ ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ১৯ ॥

সঙ্গমঃ—সঙ্গ; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—ভক্তদের; **উভয়েষাম্**—উভয়ের জন্য; **চ**—ও; **সম্মতঃ**—চূড়ান্ত; **যৎ**—যা; **সম্ভাষণ**—আলোচনা; **সম্প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন ও উত্তর; **সর্বেষাম্**—সকলের; **বিতনোতি**—বিস্তার করে; **শম্**—প্রকৃত সুখ।

অনুবাদ

যখন ভগবদ্ভক্তদের সমাবেশ হয়, তখন তাঁদের আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অভিলষিত হয়। তাই এই প্রকার সমাগম সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক এবং প্রকৃত সুখদায়ক।

তাৎপর্য

ভক্তদের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তা শ্রবণ করাই পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যবতী বার্তা শ্রবণ করার একমাত্র উপায়। যেমন, *ভগবদ্গীতা* দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে, কিন্তু যেহেতু ভক্তদের দ্বারা তার বিষয়বস্তু আলোচনা হয়নি, তাই তার প্রভাব বিস্তার হয়নি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে, পাশ্চাত্য জগতে একজনও কৃষ্ণভক্ত হয়নি। কিন্তু গুরুপরম্পরা ধারায় যখন সেই *ভগবদ্গীতার* বাণীই প্রদান করা হল, তখন তার পারমার্থিক উপলব্ধির প্রভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল।

কুমারদের অন্যতম সনৎকুমার পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ কেবল পৃথু মহারাজের পক্ষেই লাভপ্রদ হয়নি, তা কুমারদের পক্ষেও লাভপ্রদ হয়েছিল। নারদ মুনি যখন ব্রহ্মার কাছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তাই কোন সাধু যখন অন্য কোন সাধুর কাছে পরমেশ্বর ভগবান অথবা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তা সব কিছুকে চিন্ময় করে তোলে। যে ব্যক্তি এই প্রকার আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করেন, তিনি ইহজন্মে এবং পরজন্মেও লাভবান হন।

উভয়েষাম্ শব্দটি নানাভাবে বর্ণনা করা যায়। সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী। ভগবদ্ভক্তদের আলোচনা শ্রবণ করে জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয়েই লাভবান হন। ভক্তসঙ্গে জড়বাদীর এই লাভ হয় যে, তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে তার পক্ষে ভক্ত হওয়া অথবা জীবের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সম্ভাবনা বর্ধিত হয়। মানুষ যখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তখন পরবর্তী জন্মে তার মনুষ্য-জীবন লাভ করা সুনিশ্চিত হয়, অথবা তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। অর্থাৎ, মূলকথা হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তের আলোচনায় যদি

কেউ যোগদান করেন, তা হলে তিনি জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় দিক দিয়েই লাভবান হন। শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই লাভ হয়, এবং কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে পারমার্থিক বিষয়ে আলোচনা সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাই কুমারেরা স্বীকার করেছিলেন যে, এই সাক্ষাতের ফলে কেবল রাজাই লাভবান হননি, কুমারেরাও লাভবান হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে ।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

অস্তি—আছে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভবতঃ**—আপনার; **মধু-দ্বিষঃ**—ভগবানের; **পাদ-অরবিন্দস্য**—শ্রীপাদপদ্মের; **গুণ-অনুবাদনে**—মহিমা কীর্তনে; **রতিঃ**—আসক্তি; **দুরাপা**—অত্যন্ত কঠিন; **বিধুনোতি**—ধৌত করে; **নৈষ্ঠিকী**—নিষ্ঠাপরায়ণ; **কামম্**—কামাত্মক; **কষায়ম্**—অতিরঞ্জিত কামবাসনা; **মলম্**—নোংরা; **অন্তঃ-আত্মনঃ**—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।

অনুবাদ

সনৎকুমার বললেন—হে রাজন্! পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা কীর্তনে আপনি ইতিমধ্যেই অনুরক্ত। এই প্রকার অনুরাগ অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি এই প্রকার অবিচলিত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনা থেকেই তার অন্তরের সমস্ত কামবাসনা বিধৌত হয়।

তাৎপর্য

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২৫)

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হলে, ভগবানের কৃপায় জড়বাদী মানুষদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ ধীরে ধীরে বিধৌত হয়। পালিশ করা হলে রূপা যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনই

ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গের প্রভাবে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের হৃদয় কামবাসনা থেকে মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে জড় সুখ বা কামবাসনার সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। তা ঠিক নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার মতো। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সে জেগে ওঠে, এবং তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আত্মা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে চিনতে পেরে তার স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়। পৃথু মহারাজ ছিলেন স্বরূপসিদ্ধ নিত্যমুক্ত আত্মা; তাই পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল, এবং কুমারেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভগবানের দৈবী মায়ার বশীভূত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার পন্থাই হচ্ছে হৃদয়কে জড় কলুষ থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায়। কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পন্থায় কখনও হৃদয়ের কলুষ দূর করা যায় না, কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, তখন আপনা থেকেই তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ২১

শাস্ত্রেষিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যগ্বিমৃশেষু হেতুঃ ।
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যা ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রেষু—শাস্ত্রে; **ইয়ান্ এব**—কেবল এই; **সু-নিশ্চিতঃ**—স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **ক্ষেমস্য**—চরম কল্যাণের; **সধ্র্যক্**—পূর্ণরূপে; **বিমৃশেষু**—সম্যক্ বিবেচনার দ্বারা; **হেতুঃ**—কারণ; **অসঙ্গঃ**—বৈরাগ্য; **আত্ম-ব্যতিরিক্তে**—দেহাত্মবুদ্ধি; **আত্মনি**—পরমাত্মার প্রতি; **দৃঢ়া**—বলবতী; **রতিঃ**—আসক্তি; **ব্রহ্মণি**—চিন্ময়; **নির্গুণে**—জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানে; **চ**—এবং; **যা**—যা।

অনুবাদ

শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মানব-সমাজের কল্যাণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্তি-রহিত হওয়া এবং নির্গুণ ও চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করা।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে সকলেই জীবনের পরম কল্যাণ লাভের চেষ্টায় যুক্ত, কিন্তু যারা দেহাত্মবুদ্ধি-পরায়ণ, তারা জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না, এমন কি

তা যে কি, তা পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বর্ণিত হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । মানুষ যখন জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত হয়। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চিন্ময় জগতের প্রতি (*ব্রহ্মণি*) আসক্তি দৃঢ়ভাবে বর্ধিত করা উচিত। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/১) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* —পরমেশ্বর ভগবান অথবা ব্রহ্মের অনুসন্ধান ব্যতীত, জড় জগতের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা যায় না। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনিতে বিবর্তনের পন্থায় জীবনের চরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কারণ সেই সমস্ত দেহে দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার* অর্থ হচ্ছে যে, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় অথবা তার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করতে হয়। তখন চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* । ব্রহ্মে আসক্তি বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত, তারা দীর্ঘকাল সেই আসক্তি বজায় রাখতে পারে না। নির্বিশেষবাদীরা এই জগৎকে মিথ্যা বলে তা বর্জন করার পর, পুনরায় এই মিথ্যা জগতে ফিরে আসে, যদিও তারা ব্রহ্মে আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তেমনই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মতো বহু যোগী পরমাত্মারূপী ব্রহ্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে গিয়ে, নারীর শিকার হয়ে অধঃপতিত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার উপদেশ সমস্ত শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই একমাত্র পন্থা, এবং সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বৈষয়িক কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবৎ-প্রেমকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে উপদেশ দিয়েছেন (*প্রেমা পুমার্থো মহান্*)। ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি না করে, পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

শ্লোক ২২

সা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্মচর্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া ।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥ ২২ ॥

সা—সেই ভগবদ্ভক্তি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে; **ভগবৎ-ধর্ম**—ভগবদ্ভক্তি; **চর্যয়া**—আলোচনার দ্বারা; **জিজ্ঞাসয়া**—জিজ্ঞাসার দ্বারা; **অধ্যাত্মিক**—পারমার্থিক; **যোগ-নিষ্ঠয়া**—পারমার্থিক উপলব্ধির দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে; **যোগ-ঈশ্বর**—পরমেশ্বর ভগবান; **উপাসনয়া**—তাঁর আরাধনার দ্বারা; **চ**—এবং; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **পুণ্য-শ্রবঃ**—যা শ্রবণ করার ফলে; **কথয়া**—আলোচনার দ্বারা; **পুণ্যয়া**—পুণ্যের ফলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও জীবনে ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করার দ্বারা যোগেশ্বর ভগবানের আরাধনা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে, ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। এই সমস্ত কার্য পরম পবিত্র।

তাৎপর্য

যোগেশ্বর শব্দটি পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্ত উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। *ভগবদ্গীতাতে* দুই জায়গায় এই শব্দটির উল্লেখ হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৭৮) শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান শ্রীহরি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগের ঈশ্বর (*যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ*)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও (৬/৪৭) যোগেশ্বরের বর্ণনা করা হয়েছে—*স মে যুক্ততমো মতঃ* । এই *যুক্ততম* শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী—ভক্তকে ইঙ্গিত করে, যাঁকে *যোগেশ্বরও* বলা যায়। এই শ্লোকে *যোগেশ্বর-উপাসনা* কথাটির অর্থ শুদ্ধ ভক্তের সেবা। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, "*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাঞাছে কেবা।*" শুদ্ধ ভক্তের সেবা ব্যতীত পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করা যায় না। প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)

জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তিরহিত এবং ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। তাঁর সেবার ফলেই কেবল গুণময়ী জড় জগৎ অতিক্রম করা যায়। এই শ্লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা ভক্তের সেবা করার

উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*যোগেশ্বর-উপাসনয়া*)। সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের সেবা করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে, পবিত্র জীবন লাভ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/২৮) বলা হয়েছে যে, পুণ্যবান না হলে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

ভগবানের সেবায় স্থিত হতে হলে, জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হতে হয়। ভগবদ্ভক্তির শুরুতেই সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, *আদৌ গুর্বাশ্রয়ম্*, এবং সদ্গুরুর কাছে পারমার্থিক ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় (*সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা*), এবং মহান ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় (*সাধুমার্গ-অনুগমনম্*)। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী এই উপদেশগুলি দিয়েছেন।

মূল কথা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হয়, এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবানের বাণী ও মহিমা শ্রবণ করতে হয়। এইভাবে যখন ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস জন্মায়, তখন অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়।

শ্লোক ২৩

অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ ॥ ২৩ ॥

অর্থ—ধনসম্পদ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আরাম**—তৃপ্তি; **স-গোষ্ঠী**—তাদের সঙ্গীগণ-সহ; **অতৃষ্ণয়া**—বিতৃষ্ণার দ্বারা; **তৎ**—তা; **সম্মতানাম্**—তাদের দ্বারা অনুমোদিত; **অপরিগ্রহেণ**—অস্বীকার করার ফলে; **চ**—ও; **বিবিক্ত-রুচ্যা**—অরুচি; **পরিতোষে**—সুখ; **আত্মনি**—স্বীয়; **বিনা**—ব্যতীত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ**—গুণাবলী; **পীযূষ**—অমৃত; **পানাৎ**—পান করার ফলে।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়। কেবল সেই প্রকার ব্যক্তিকেই নয়, এমন কি যারা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গও পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীহরির মহিমারূপ অমৃত পান না করে সে শান্তিতে থাকতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায়।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই ধনসম্পদ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব ধন উপার্জন করা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে তা ব্যয় করা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বর্ণনা করে বলেছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২/১/৩)

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের এটিই হচ্ছে আদর্শ উদাহরণ। রাত্রিবেলা ছয় ঘণ্টার বেশি ঘুমিয়ে অথবা মৈথুন-ক্রিয়ায় তারা তাদের সময়ের অপচয় করে। এটি হচ্ছে তাদের রাতের কর্ম, আর দিনের বেলায় তারা অফিসে অথবা ব্যবসার স্থানে গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। কিছু টাকা পাওয়া মাত্রই তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য নানান জিনিস খরিদ করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনও জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতে চেষ্টা করে না। ভগবান কে, জীবাত্মা কি, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি, ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা কখনও ভেবে দেখে না। বর্তমানে অবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে, যাদের ধার্মিক বলে মনে করা হয়, তারাও কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত। এই কলিযুগে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অন্যান্য যুগের থেকে অনেক বেশি; তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের সেবা করা, এবং সেই সঙ্গে ধন উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা। তাই বলা হয়েছে— *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতিসাধন করতে হলে, জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হতে হবে। যে বিষয় ভক্তের তৃপ্তিসাধন করে, তা অভক্তদের কাছে সম্পূর্ণ অরুচিকর।

কেবল নিষ্ক্রিয় হলে অথবা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে না, যথাযথ বৃত্তিতে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পারমার্থিক উন্নতিসাধনে আগ্রহী ব্যক্তিরা বৈষয়িক ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করে নির্জন স্থানে যান, যা যোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু তাও পারমার্থিক জীবনে উন্নতি-সাধনের সহায়ক হবে না, কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে, এই প্রকার যোগীদেরও অধঃপতন হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে, জ্ঞানীরাও অধঃপতিত হয়। নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদীরা জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে, চিন্ময় স্তরে স্থির থাকতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। সেই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*বিনা হরের্গুণ-পীযূষপানাৎ* । ভগবানের মহিমা-অমৃত পান করতে হবে, অর্থাৎ, সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি-সাধনের প্রধান পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়েছেন, যা আমরা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে দেখতে পাই। কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে চান, তা হলে তাঁর মহা সৌভাগ্যের ফলে তিনি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই কৃপার ফলে, তিনি ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন, এবং তিনি যদি সেই বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপণ করেন এবং তাতে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করেন, তা হলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই ভক্তিলতা বর্ধিত হতে থাকে, সেই ভক্তিলতা এতই প্রবল যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ-জগতে গিয়ে পৌঁছায় এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত, তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক যেমন সাধারণ লতা ছাদের আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত বর্ধিত হতে থাকে। তার পর তাতে বাঞ্ছিত ফল ফলে। এই ফল উৎপন্ন হওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল ভক্তিলতায় সিঞ্চন করা। এর তাৎপর্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহী মানুষ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত থাকতে পারেন না; তাঁকে অবশ্যই ভক্তসঙ্গে বাস করতে হয়, যেখানে তিনি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের শত শত কেন্দ্র মানুষকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার সুযোগ দিতে পারে, এবং তার ফলে মানুষ তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক ২৪

অহিংসয়া পারমহংস্যচর্যয়া
স্মৃত্যা মুকুন্দাচরিতাগ্র্যসীধুনা ।
যমৈরকামৈর্নিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া
নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ॥ ২৪ ॥

অহিংসয়া—অহিংসার দ্বারা; **পারমহংস্য-চর্যয়া**—মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **স্মৃত্যা**—স্মরণের দ্বারা; **মুকুন্দ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আচরিত-অগ্র্য**—কেবল তাঁর কার্যকলাপ প্রচার করার ফলে; **সীধুনা**—অমৃতের দ্বারা; **যমৈঃ**—বিধিনিষেধ পালনের দ্বারা; **অকামৈঃ**—বিষয় বাসনাবিহীন; **নিয়মৈঃ**—নিষ্ঠা সহকারে নিয়মসমূহ পালনের দ্বারা; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অনিন্দয়া**—নিন্দা না করে; **নিরীহয়া**—সরলভাবে জীবন যাপন করে; **দ্বন্দ্ব**—দ্বৈতভাব; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পারমার্থিক উন্নতিসাধনে যিনি আগ্রহী, তাঁর পক্ষে অবশ্যই অহিংসা, আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলা স্মরণ, বিষয় বাসনারহিত হয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন, এগুলি অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সময়, কখনও অপরের নিন্দা করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য সরল জীবন যাপন করা এবং বিরোধী তত্ত্বের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি সর্বদা সহ্য করতে চেষ্টা করা।

তাৎপর্য

ভক্তেরা প্রকৃতপক্ষে সাধু। সাধু বা ভক্তের প্রথম গুণ হচ্ছে অহিংসা। যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী, তাদের প্রথমেই অহিংসার আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সাধুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে *তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/২১)। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং অন্যের প্রতি কৃপালু হওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে আহত হলে তা সহ্য করেন, কিন্তু অন্য কেউ যদি আঘাত পায়, ভগবদ্ভক্ত তখন তা সহ্য করেন না। সারা পৃথিবী হিংসায় পূর্ণ এবং ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেই হিংসা বন্ধ করা, বিশেষ করে অনর্থক যে পশুহত্যা হচ্ছে

তা বন্ধ করা। ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব-সমাজেরই সুহৃৎ নন, তিনি সমস্ত জীবের পরম বন্ধু, কারণ তিনি সমস্ত জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তানরূপে দর্শন করেন। তিনি কেবল নিজেকে ভগবানের সন্তান বলে দাবি করে অন্যদের আত্মা নেই বলে তাদের হত্যা করতে অনুমোদন করেন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই প্রকার বিচারধারা পোষণ করেন না। তিনি *সুহৃদঃ সর্ব-দেহিনাম্*—ভগবানের প্রকৃত ভক্ত সমস্ত জীবদের পরম বন্ধু। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের পিতা; তাই কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তাকে বলা হয় *অহিংসা* । এই প্রকার অহিংসার আচরণ তখনই সম্ভব, যখন আমরা মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তাই, বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে, আমাদের চারটি সম্প্রদায়ের মহান আচার্যদের বা গুরু-পরম্পরার অনুসরণ করতে হয়।

গুরু-পরম্পরা ব্যতীত পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা হাস্যকর। তাই বলা হয়েছে *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ* —যিনি আচার্য পরম্পরাকে অনুসরণ করেন, তিনি বস্তুকে প্রকৃতরূপে জানতে পারেন (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/১৪/২)। *তদ্-বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ* — দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/২/১২)। পারমার্থিক জীবনে *স্মৃত্যা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *স্মৃত্যা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা। জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হয়, যাতে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ না করে থাকা না যায়। এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়, চলার সময়, কাজ করার সময় সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে উপদেশ দেওয়া হয় যে, আমাদের জীবন যেন আমরা এমনভাবে গড়ে তুলি, যাতে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভক্তরা যখন 'স্পিরিচুয়াল স্কাই' নামক আগরবাতি তৈরি করে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণভক্তের মহিমা শ্রবণ করে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ* —সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। *বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ* —কখনও বিষ্ণুকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবন—*স্মৃত্যা* । আমরা যদি নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করি, তা হলে এই প্রকার স্মরণ সম্ভব। তাই এই শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— *মুকুন্দাচরিতাগ্র্য-সীধুনা* । *সীধু* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অমৃত'। *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* অথবা এই প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করা মানে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় বাস করা। যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বিধিনিষেধ পালন করেন, তাঁদের পক্ষেই এইভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া সম্ভব। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলনে আমরা ভক্তদের প্রতিদিন জপমালায় ষোল মালা জপ করা এবং বিধি-নিষেধগুলি পালন করার নির্দেশ দিই। ভক্তদের পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধনে তা সাহায্য করে।

এই শ্লোকে এই কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা (*যমৈঃ*) পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলে, মানুষ *স্বামী* অথবা *গোস্বামী* হতে পারেন। তাই যাঁরা *স্বামী* অথবা *গোস্বামী,* এই চূড়ান্ত উপাধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ইন্দ্রিয়-সংযম করা অবশ্য কর্তব্য। নিঃসন্দেহে তাঁকে ইন্দ্রিয়ের স্বামী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গুলি যদি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে চায়, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলিকে সংযত করা। আমরা যদি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবণতা বর্জন করি, তা হলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয়-সংযম হবে।

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অনিন্দয়া*—আমাদের কখনও অন্যদের ধর্মের সমালোচনা করা উচিত নয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম রয়েছে। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম কখনও সাত্ত্বিক ধর্মের মতো পূর্ণ নয়। *ভগবদ্গীতায়* সব কিছুই তিনটি গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে; তাই ধর্মের পন্থাও সেই অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। মানুষ যখন প্রধানত রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তখন তাদের ধর্মের পন্থাও সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই সমস্ত পন্থার সমালোচনা করার পরিবর্তে, ভগবদ্ভক্ত সেই সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের তাদের স্বীয় ধর্ম অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাতে তারা ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক ধর্মের স্তরে উন্নীত হতে পারে। তা না করে ভক্ত যদি কেবল তাদের সমালোচনাই করেন, তা হলে ভক্তের মন ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং চিত্তের বিক্ষোভ রোধ করতে চেষ্টা করা।

ভক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে *নিরীহয়া,* অর্থাৎ সরল জীবন যাপন করা। *নিরীহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভদ্র', 'বিনীত' অথবা 'সরল'। বিষয়ীদের মতো অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্তকে উন্নত ভাবধারা সমন্বিত সরল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির আচরণের উদ্দেশ্যে দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই তাঁর গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা অথবা নিদ্রা যাওয়া তাঁর উচিত নয়। কেবলমাত্র দেহ ধারণের জন্য আহার করা উচিত, কিন্তু আহার করার জন্য তাঁর দেহ ধারণ

করা উচিত নয়, এবং কেবলমাত্র ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। ভক্তদের এই আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। যতক্ষণ দেহ রয়েছে, ততক্ষণ তা ঋতু পরিবর্তন, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ও ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। সেগুলি এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নবীন ভক্তরা কখনও কখনও চিঠিতে প্রশ্ন করে, কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, কেন তাদের রোগ হচ্ছে। এই শ্লোক থেকে তাদের জানা উচিত যে, তাদের এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য করতে হবে (*দ্বন্দ্ব-তিতিক্ষয়া*) এই জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত। কখনও কারও মনে করা উচিত নয় যে, অসুখ হলে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। জড়-জাগতিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন চলতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন, *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত* —"হে অর্জুন! ভক্তিতে স্থির হয়ে, এই সমস্ত বিড়ম্বনা সহ্য করতে চেষ্টা কর।"

শ্লোক ২৫

হরের্মুহুস্তৎপরকর্ণপূর-
গুণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া ।
ভক্ত্যা হ্যসঙ্গঃ সদসত্যনাত্মনি
স্যান্নির্গুণে ব্রহ্মণি চাঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৫ ॥

হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **তৎ-পর**—ভগবান সম্পর্কে; **কর্ণ-পূর**—কর্ণভূষণ; **গুণ-অভিধানেন**—দিব্য গুণাবলীর আলোচনা; **বিজৃম্ভমাণয়া**—কৃষ্ণভক্তি বর্ধনের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসঙ্গঃ**—নিষ্কলুষ; **সৎ-অসতি**—জড় জগৎ; **অনাত্মনি**—চিন্ময় উপলব্ধির বিরোধী; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **নির্গুণে**—চিৎ-স্তরে; **ব্রহ্মণি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **চ**—এবং; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **রতিঃ**—আকর্ষণ।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলী শ্রবণ দ্বারা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবানের লীলাসমূহ ভক্তের কর্ণভূষণ-সদৃশ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত হওয়ার দ্বারা, অনায়াসে চি. পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে শ্রবণের দ্বারা ভক্তির পুষ্টিসাধনের উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ অথবা লীলাবিলাস ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে শ্রবণ করতে চান না। আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির কাছে *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি করা যায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যতই শ্রবণ করা যায়, ততই ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করা যায়। ভগবদ্ভক্তিতে আমরা যতই উন্নতিসাধন করি, ততই আমরা জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে, জড় জগতের প্রতি আমরা যতই অনাসক্ত হই, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি ততই বর্ধিত হয়। তাই, যে ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতিসাধন করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁর পক্ষে অর্থ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১১/৮)

এই শ্লোকে *ব্রহ্মণি* শব্দটির টীকায় আসুরী বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক নির্বিশেষবাদী অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* পেশাদারি পাঠকেরা বলে যে, *ব্রহ্মণি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু এই শ্লোকের *ভক্ত্যা* ও *গুণাভিধানেন* শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থ সমীচীন নয়। নির্বিশেষবাদীদের মতে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন দিব্যগুণ নেই; তাই *ব্রহ্মণি* শব্দটির অর্থ 'পরমেশ্বর ভগবানে' বলে বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন স্বীকার করেছেন; তাই যখনই *ব্রহ্ম* শব্দটির ব্যবহার হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকে নয়। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)। ব্রহ্ম বলতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে বোঝাতে পারে, কিন্তু যখন সেই শব্দটি *ভক্তি* অথবা দিব্য গুণাবলীর স্মরণ সম্বন্ধে উল্লেখ হয়, তখন তা পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে নয়।

শ্লোক ২৬

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমা-
নাচার্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা ।
দহত্যবীর্যং হৃদয়ং জীবকোশং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥ ২৬ ॥

যদা—যখন; **রতিঃ**—আসক্তি; **ব্রহ্মণি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **নৈষ্ঠিকী**—স্থির; **পুমান্**—ব্যক্তি; **আচার্যবান্**—শ্রীগুরুদেবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিরাগ**—অনাসক্তি; **রংহসা**—বলের দ্বারা; **দহতি**—দহন করে; **অবীর্যম্**—দুর্বল; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **জীব-কোশম্**—আত্মার আবরণ; **পঞ্চ-আত্মকম্**—পঞ্চভূত; **যোনিম্**—জন্মের উৎস; **ইব**—সদৃশ; **উত্থিতঃ**—উদ্ভূত; **অগ্নিঃ**—আগুন।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী রতিলাভ করার ফলে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার ফলে, জীব শরীরের অন্তঃস্থলে স্থিত হয়ে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, তার ভৌতিক পরিবেশকে দগ্ধীভূত করে, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নি সেই কাষ্ঠকেই ভস্মীভূত করে দেয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই একসঙ্গে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন। বৈদিক শ্লোকে বলা হয়েছে, *হৃদি হ্যয়ম্ আত্মা* —আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই হৃদয়ে বাস করেন। আত্মা যখন ভৌতিক হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে অথবা হৃদয় যখন চিন্ময়ত্ব লাভের জন্য নির্মল হয়, তখন আত্মার মুক্তি হয়। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত—*যোনিম্ ইবোত্থিতোঽগ্নিঃ* । কাঠ থেকে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং সেই আগুনের দ্বারাই সেই কাঠ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি জীবের ঐকান্তিক আসক্তি ঠিক অগ্নির মতো। তাপ ও আলোকের মাধ্যমে যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান জীবাত্মা যখন পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জগতের প্রতি অনাসক্ত হন, তখন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা রচিত তাঁর জড় আবরণ দগ্ধীভূত হয়, এবং তখন তিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ থেকেও মুক্ত হন। তাই এই শ্লোকে *পঞ্চাত্মকম্* শব্দটি পঞ্চ-মহাভূতকে ইঙ্গিত করে অথবা জড় কলুষের

পাঁচটি আবরণকে ইঙ্গিত করে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অগ্নিতে যখন এই সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যায়, তখন মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিপরায়ণ হয়। সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, হৃদয়ের পঞ্চ আবরণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জীবাত্মা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত, এবং তাকে মুক্ত করার অর্থ হচ্ছে তার হৃদয় থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া। এটিই পদ্ধতি। অবশ্যই তাকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশে ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, এবং তার ফলে সে জড় জগৎ থেকে অনাসক্ত হয়, এবং এইভাবে সে মুক্ত হয়। তাই, উত্তম ভক্ত তাঁর জড় দেহে বাস করেন না, তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে বিরাজ করেন, ঠিক যেমন শুকনো নারকেল খোলের মধ্যে থাকলেও তা খোল থেকে আলাদা। তাই শুদ্ধ ভক্তের শরীরকে বলা হয় চিন্ময় শরীর বা দিব্য শরীর। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তের শরীর জড় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মুক্ত *(ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে)*। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীও তা প্রতিপন্ন করেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তাঁর শরীর, মন ও বাণীর দ্বারা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি মুক্ত, এমন কি এই জড় শরীরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত।"

শ্লোক ২৭

দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্‌গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্‌ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে ॥ ২৭ ॥

দগ্ধ-আশয়ঃ—সমস্ত জড়-বাসনা দগ্ধ হয়ে; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত**—সমস্ত; **তৎ-গুণঃ**—জড় গুণাবলী; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—আত্মা অথবা পরমাত্মা; **বহিঃ**—বাহ্য; **অন্তঃ**—আভ্যন্তরীণ; **বিচষ্টে**—কার্যশীল; **পর-আত্মনোঃ**—পরমাত্মার; **যৎ**—যা; **ব্যবধানম্**—পার্থক্য; **পুরস্তাৎ**—শুরুতে যেমন ছিল; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তৎ**—তা; **বিনাশে**—সমাপ্ত হলে।

অনুবাদ

কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন এবং সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আত্ম-উপলব্ধির পূর্বে, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা আর তখন থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, সমস্ত জড়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য (*অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্*)। কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন, তখন আর মনোধর্মী জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের আবশ্যকতা থাকে না। তখন বুঝতে হবে যে, তিনি জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত। তার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে—ঠিক যেমন শুকনো নারকেল তার বাইরের খোসা থেকে আলাদা। সেটিই হচ্ছে মুক্তির স্তর। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) যেমন বলা হয়েছে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে *স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ* —স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে থাকে, ততক্ষণ সমস্ত জড় বাসনাগুলি থাকে, কিন্তু কেউ যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তখন আর তাঁর বাসনাগুলি জড় থাকে না। ভগবদ্ভক্ত এই চেতনায় কার্য করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত জড় বাসনাগুলি সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন মুক্ত হওয়া যায়।

কেউ যখন জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন আর তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু করেন না। তখন তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই চিন্ময়। বদ্ধ অবস্থায় দুই প্রকার কার্যকলাপ হয়। মানুষ শরীরের জন্য কার্য করে, এবং সেই সঙ্গে সে মুক্ত হতে চায়। ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় বাসনা অথবা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি দেহের জন্য কর্ম এবং আত্মার জন্য কর্মের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত হন। তখন দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি মুক্ত। তাঁকে বলা হয় *জীবন্মুক্তঃ*, অর্থাৎ এই শরীরে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। সেই প্রকার মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের

কর্ম এবং মুক্ত হওয়ার কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেউ যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন আর তাঁকে শোক অথবা মোহের প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয় না। কর্মী ও জ্ঞানীদের কার্যকলাপ শোক ও মোহের বশবর্তী, কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কার্য করেন যে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মুক্ত পুরুষ, তাঁকে কখনও শোক অথবা মোহের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় না। এটিই হচ্ছে একত্বের স্তর, বা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে মগ্ন হওয়া। অর্থাৎ জীবের পৃথক সত্তা থাকলেও তার স্বার্থ পৃথক নয়। তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁর ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁকে কিছুই করতে হয় না; তাই তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, নিজেকে নয়। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ তখন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্নের সমাপ্তি হয়। স্বপ্নে মানুষ কখনও নিজেকে একজন রাজারূপে দর্শন করে, এবং সে রাজকীয় সামগ্রী, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি দর্শন করে, কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে যায়, তখন আর সে নিজেকে ছাড়া অন্য আর কিছু দেখতে পায় না। তেমনই, মুক্ত পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যদিও তাঁরা উভয়েই তাঁদের পৃথক সত্তা বজায় রাখেন। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । পরমাত্মা ও আত্মার একত্বের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত ।

শ্লোক ২৮

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থং চ পরং যদুভয়োরপি ।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৮ ॥

আত্মানম্—আত্মা; **ইন্দ্রিয়-অর্থম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **চ**—এবং; **পরম্**—দিব্য; **যৎ**—যা; **উভয়োঃ**—উভয়; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সতি**—অবস্থিত হয়ে; **আশয়ে**—জড় বাসনা; **উপাধৌ**—উপাধি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুমান্**—ব্যক্তি; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **ন অন্যদা**—অন্যথা নয়।

অনুবাদ

আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন বাসনা সৃষ্টি করে, এবং সেই কারণে সে উপাধিযুক্ত হয়। কিন্তু আত্মা যখন চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়, তখন তার ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্যে রুচি থাকে না।

তাৎপর্য

জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, আত্মা বিশেষ প্রকার দেহের উপাধিতে আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। তার ফলে সে নিজেকে একটি পশু, মানুষ, দেবতা, পক্ষী ইত্যাদি বলে মনে করে। অহঙ্কার-জনিত ভ্রান্ত পরিচিতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে, এবং মায়িক জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, সে জড় ও চেতনের মধ্যে ভেদ দর্শন করে। মানুষ যখন এই প্রকার ভেদভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন আর সে জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে না। তখন কেবল চেতনেরই প্রাধান্য বিরাজ করে। মানুষ যখন জড় বাসনার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে নিজেকে প্রভু অথবা ভোক্তা বলে মনে করে। তার ফলে সে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কার্য করে এবং জড় সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু সে যখন জীবনের এই ধারণা থেকে মুক্ত হয়, তখন আর সে উপাধির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং তখন আর সে সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তার বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব ২/২৫৫) বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

মুক্ত পুরুষদের জড় বস্তুর প্রতি অথবা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি কোন রকম আসক্তি থাকে না। তিনি বুঝতে পারেন যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাই সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। তাই তিনি কোন কিছুই পরিত্যাগ করেন না। কোন কিছুই পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয় তা *পরমহংস* জানেন। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই চিন্ময়, কোন কিছুই জড় নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* (*মধ্য* ৮/২৭৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহাভাগবত বা অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভক্তের জড় দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

যদিও তিনি বৃক্ষ, পর্বত ও অন্যান্য জঙ্গম জীবদের দর্শন করেন, তবুও তিনি সব কিছুই ভগবানের সৃষ্টিরূপে দর্শন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি কেবল স্রষ্টাকেই দর্শন করেন, সৃষ্টিকে নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। তিনি সব কিছুতেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সব কিছুকে দর্শন করেন। এটিই হচ্ছে অদ্বয়জ্ঞান।

শ্লোক ২৯

নিমিত্তে সতি সর্বত্র জলদাবপি পূরুষঃ ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা ॥ ২৯ ॥

নিমিত্তে—কারণের ফলস্বরূপ; **সতি**—হয়ে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **জল-আদৌ অপি**—জল ও অন্য প্রতিবিম্বের মাধ্যম; **পূরুষঃ**—পুরুষ; **আত্মনঃ**—নিজে; **চ**—এবং; **পরস্য অপি**—অন্যকে; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **ন অন্যদা**—অন্য কোন কারণ নেই।

অনুবাদ

বিভিন্ন কারণের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে একই শরীরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আত্মা এক, এবং তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি *স্বাংশ* ও *বিভিন্নাংশ* রূপে প্রকাশিত হন। জীব হচ্ছে *বিভিন্নাংশ* । ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা হচ্ছেন *স্বাংশ* । এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, এবং বিভিন্নভাবে তাদের বিস্তার হয়। এইভাবে, বিভিন্ন কারণে সেই একই তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন বিস্তার হয়। সেই উপলব্ধি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, কিন্তু জীব যখন উপাধির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখন সে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে দৃষ্ট নিজের প্রতিবিম্বকে ভিন্ন বলে মনে হয়। জলে যখন কোন কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন তা সচল বলে মনে হয়। বরফে যখন সেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন তা স্থির বলে মনে হয়। যখন তা তেলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তা অস্পষ্ট বলে মনে হয়। একই বস্তুকে এইভাবে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। যখন সেই মাধ্যম সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সমস্ত বস্তুটিকে এক বলে প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে পরমহংস বা জীবনের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল সর্বত্র দর্শন করেন। তাঁর কাছে তখন আর অন্য বস্তু থাকে না।

এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিভিন্ন কারণের ফলে জীবাত্মা পশু, মানুষ, দেবতা, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ভিক্ষা করে। তারা আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি এই জড় ঐশ্বর্য প্রতিহত হয়, তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আর ভক্তদের প্রণাম করবে না। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই সর্বদা আগ্রহী। তারা সাধুদের অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের প্রচার-কার্যের জন্য কিছু দান করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান সেই ভক্তকে তাঁর জড়-জাগতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য করেন। ভগবান যেহেতু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন না, তাই মানুষ সাধারণত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে ভয় পায়। কারণ তারা মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবেরা জড় ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা শিবের পূজা করে অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রভূত সুযোগ লাভ করে, কারণ শিব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষা দুর্গাদেবীর পতি। শিবের কৃপায় শিবভক্তরা দুর্গাদেবীর আশীর্বাদ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যেমন রাবণ ছিল মস্ত বড় শিব উপাসক ও শিবের ভক্ত, এবং তার ফলে সে দুর্গাদেবীর এমন কৃপালাভ করেছিল যে, তার সমগ্র রাজধানী সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে, এবং পুরাণে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সেটি ছিল রাবণের রাজধানী। কিন্তু সেই রাজধানী রামচন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই প্রকার ঘটনা অধ্যয়নের ফলে, আমরা *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটির পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করেন না, কারণ তার ফলে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে পুনরায় এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের ফলে, রাবণের মতো ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে হরণ করার দুঃসাহস করেছিল। সে মনে করেছিল যে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে সে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার কর্মের দ্বারা রাবণ *বিধ্বংসিত*, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়েছিল। বর্তমান মানব-সভ্যতা অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে, এবং তাই ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে।

চক্র থেকে মুক্ত হতে পারি। এই উপায়ের দ্বারা আমরা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবিচলিত শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারি। মনকে যদি নিরন্তর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে চিন্তা করতে দেওয়া হয়, তা হলে তা আমাদের জড় বন্ধনের কারণ হয়। আমাদের মন যদি কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভাবনায় পূর্ণ হয়, তা হলে কৃষ্ণভক্ত হতে চাইলেও, নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয় বিস্মৃত হওয়া যায় না। কেউ যদি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মনকে সংযত করতে না পারে, তা হলে সে কেবল পরিবার, সমাজ, মূল্যবান গৃহ ইত্যাদি ভোগের বিষয়েই চিন্তা করবে। সে যদি হিমালয় পর্বত অথবা বনেও যায়, তা হলেও তার মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়েই নিরন্তর চিন্তা করতে থাকবে। এইভাবে ক্রমশ তার বুদ্ধি প্রভাবিত হবে। বুদ্ধি যখন প্রভাবিত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার মূল স্বাদ হারিয়ে যায়।

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। যদি কোন বিশাল জলাশয়ের চারপাশে সর্বত্র বড় বড় কুশঘাস থাকে, তা হলে সেই জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায়। তেমনই, যখন জড় সুখভোগের বাসনা স্তম্ভের মতো বর্ধিত হয়, তখন চিত্তরূপী সরোবরের শুদ্ধ চেতনারূপ জল শুকিয়ে যায়। তাই প্রথম থেকেই এই সমস্ত কুশঘাস-সদৃশ জড় বাসনা কেটে ফেলে দিতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, প্রথম থেকেই যদি শস্যক্ষেত্রের আগাছাগুলি উপড়ে ফেলে না দেওয়া হয়, তা হলে সেগুলি সার ও জল শোষণ করে নেবে এবং ধানের চারাগুলি শুকিয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে আমাদের এই জড় জগতে অধঃপতনের কারণ, এবং তার ফলে আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ এবং ত্রিতাপ দুঃখভোগ করছি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বাসনাগুলি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করি, তা হলে আমাদের বাসনাগুলি পবিত্র হবে। বাসনাগুলিকে হত্যা করা যায় না। সেগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে পবিত্র করতে হয়। আমরা যদি নিরন্তর কোন বিশেষ রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের সদস্য বলে মনে করে নিরন্তর সেগুলি চিন্তা করি, তা হলে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের বাসনা যদি ভগবানের সেবায় প্রয়োগ করা হয়, তা হলে তা শুদ্ধ হয়, এবং তার ফলে আমরা তৎক্ষণাৎ জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ৩১

ভ্রশ্যত্যনুস্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে ।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

ভ্রশ্যতি—বিনষ্ট হয়; **অনুস্মৃতিঃ**—নিরন্তর চিন্তা করে; **চিত্তম্**—চেতনা; **জ্ঞান-ভ্রংশঃ**—প্রকৃত জ্ঞানরহিত; **স্মৃতি-ক্ষয়ে**—স্মৃতি বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **তৎ-রোধম্**—সেই পন্থা অবরুদ্ধ করে; **কবয়ঃ**—মহান পণ্ডিতগণ; **প্রাহুঃ**—মত প্রকাশ করেছেন; **আত্ম**—আত্মার; **অপহ্নবম্**—বিনাশ; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

জীব যখন তার মূল চেতনা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সে তার পূর্বস্থিতি স্মরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা তার বর্তমান স্থিতি বুঝতে পারে না। স্মৃতি যখন হারিয়ে যায়, তখন অর্জিত জ্ঞান এক ভ্রান্ত আধারের ভিত্তিতে আহরণ হয়। যখন তা হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাকে আত্মার বিনাশ বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

জীব অথবা আত্মা নিত্য ও শাশ্বত। তার কখনও বিনাশ হয় না, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান যখন কাজ করে না, তখন পণ্ডিতেরা বলেন যে, তার বিনাশ হয়েছে। সেটিই হচ্ছে পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য। অল্পজ্ঞ দার্শনিকদের মতে, পশুদের আত্মা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশুদের আত্মা রয়েছে। পশুদের অজ্ঞানের আবরণ এতই প্রবল যে, মনে হয় যেন তাদের আত্মা হারিয়ে গেছে। আত্মা ব্যতীত শরীর সক্রিয় হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে জীবিত দেহ ও মৃত দেহের মধ্যে পার্থক্য। আত্মা যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন দেহটিকে বলা হয় মৃত। যখন প্রকৃত জ্ঞান প্রদর্শিত হয় না, তখন বলা হয় যে, আত্মার বিনাশ হয়েছে। আমাদের মূল চেতনা হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা, কারণ আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। এই চেতনা যখন ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়, তখন জীব জড় পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং তখন তার মূল চেতনা কলুষিত হয়। তখন সে মনে করে যে, সে জড় উপাদান থেকে উদ্ভূত। এইভাবে জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে তার প্রকৃত স্মৃতি হারিয়ে ফেলে, ঠিক যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়। যখন এইভাবে প্রকৃত চেতনার ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, তখন এক ভ্রান্ত পরিচিতির ভিত্তিতে বিনষ্ট আত্মা তার কার্যকলাপ সম্পাদন করে। বর্তমানে মানব-সমাজ দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত স্তরে কার্য করছে; তার ফলে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে মানুষদের আত্মা বিনষ্ট হয়েছে, এবং সেই সূত্রে তাদের অবস্থা পশুদের থেকে কোন অংশে উন্নত নয়।

শ্লোক ৩২

নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্ত্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **অতঃ**—এর পর; **পরতরঃ**—শ্রেয়; **লোকে**—এই জগতে; **পুংসঃ**—জীবদের; **স্ব-অর্থ**—ব্যক্তিগত লাভ; **ব্যতিক্রমঃ**—প্রতিবন্ধক; **যৎ-অধি**—তার অতীত; **অন্যস্য**—অন্যদের; **প্রেয়স্ত্বম্**—অধিকতর রুচিকর; **আত্মনঃ**—নিজের জন্য; **স্ব**—নিজের; **ব্যতিক্রমাৎ**—প্রতিবন্ধকের দ্বারা।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির থেকে অধিক প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু আছে বলে মনে করাই, নিজের হিতসাধনে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। 'আত্মা' বলতে পরমাত্মা ও ব্যষ্টি আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান ও জীবকে বোঝায়। কিন্তু কেউ যখন দেহ ও দেহসুখের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, তখন সে তার আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মায়ার প্রভাবে জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, যা এই জগতে আত্ম-উপলব্ধি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য বর্জিত। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, পরমাত্মার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের কার্যকলাপে সেই প্রবণতাকে পরিচালিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যা কিছুই করা হোক না কেন, তা জীবের স্বার্থের পরিপন্থী।

শ্লোক ৩৩

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্ ।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্‌যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—ধন; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য; **অভিধ্যানম্**—নিরন্তর চিন্তা করে; **সর্ব-অর্থ**—চতুর্বর্গ; **অপহ্নবঃ**—ধ্বংসাত্মক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **ভ্রংশিতঃ**—রহিত হয়ে; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিজ্ঞানাৎ**—ভক্তি; **যেন**—এই সবের দ্বারা; **আবিশতি**—প্রবেশ করে; **মুখ্যতাম্**—স্থাবর-জীবন।

অনুবাদ

কিভাবে ধন উপার্জন করা যায় এবং তা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা যায়, সেই চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও ভক্তিরহিত হওয়ার ফলে, বৃক্ষ অথবা পাথর যোনিতে প্রবিষ্ট হতে হয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া, এবং *বিজ্ঞান* বলতে জীবনে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝায়। মনুষ্য-জীবন লাভের পর এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হওয়া উচিত, কিন্তু এই মহান সুযোগ লাভের পরেও কেউ যদি এই জ্ঞান বিকশিত না করে এবং শ্রীগুরুদেবের ও শাস্ত্রের সাহায্যের মাধ্যমে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ না করে—অর্থাৎ, এই সুযোগের অপব্যবহার করে—তা হলে পরবর্তী জীবনে সে অবশ্যই স্থাবর যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে। পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি হচ্ছে স্থাবর-জীব। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় *পুণ্যতাম্* বা *মুখ্যতাম্*, অর্থাৎ, সমস্ত কার্যকলাপ শূন্যে পরিণত করা। যে-সমস্ত দার্শনিকেরা নিষ্ক্রিয় হওয়ার মতবাদ সমর্থন করে, তাদের বলা হয় *শূন্যবাদী* । প্রকৃতির পরিচালনায়, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এমন অনেক দার্শনিক রয়েছে, যারা তাদের কার্যকলাপ পবিত্র করার পরিবর্তে, সব কিছুকেই শূন্যে পরিণত করতে চায় অথবা সমস্ত কার্যকলাপ-রহিত করতে চায়। এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক হচ্ছে বৃক্ষ ও পর্বত। প্রকৃতির নিয়মে তারা এক প্রকার দণ্ডভোগ করছে। আমরা যদি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্ম-উপলব্ধি যথাযথভাবে সম্পাদন না করি, তা হলে প্রকৃতি আমাদের বৃক্ষ অথবা পর্বতযোনি প্রদানের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে দণ্ডদান করবে। তাই এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করার নিন্দা করা হয়েছে। সর্বদা অর্থ উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চিন্তায় যে মগ্ন থাকে, সে আত্মহত্যার পন্থা অনুসরণ করছে। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র মানব-সমাজ এই পথ অনুসরণ করছে। মানুষ যেন-তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহে বদ্ধপরিকর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ভিক্ষা করে হোক, ঋণ করে হোক অথবা চুরি করে হোক, তারা অর্থ সংগ্রহ করতে চায়। আত্ম-উপলব্ধির পথে এই প্রকার সভ্যতা সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ৩৪

ন কুর্যাৎকর্হিচিৎসঙ্গং তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥ ৩৪ ॥

ন—করে না; **কুর্যাৎ**—কার্য; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **তমঃ**—অজ্ঞান; **তীব্রম্**—তীব্র গতিতে; **তিতীরিষুঃ**—অজ্ঞান অতিক্রম করতে অভিলাষী ব্যক্তিরা; **ধর্ম**—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—ইন্দ্রিয়সুখ; **মোক্ষাণাম্**—মুক্তির; **যৎ**—যা; **অত্যন্ত**—অত্যধিক; **বিঘাতকম্**—প্রতিবন্ধক বা বাধা।

অনুবাদ

যারা অজ্ঞান-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কখনও তমোগুণের সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ ভোগবাদী কার্যকলাপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

জীবনের চারটি বর্গ মানুষকে ধর্মীয় নীতি, সামাজিক স্থিতি অনুসারে অর্থ উপার্জন, বিধিনিষেধ অনুসারে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ রয়েছে, ততক্ষণ এই সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন বর্জন করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জনের জন্য কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আধুনিক মানব-সভ্যতা ধর্মীয় অনুশাসনের ধার ধারে না। তা কেবল ধর্মীয় অনুশাসন বর্জিত অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই আগ্রহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কসাইখানায় কসাইয়েরা অনায়াসে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু এই প্রকার ব্যবসা ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বহু নাইট ক্লাব এবং মৈথুনের জন্য বেশ্যালয় রয়েছে। বিবাহিত জীবনে অবশ্য মৈথুনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ, কারণ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। তেমনই, সরকার যদিও মদিরালয় খোলার অনুমতি দিতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অবাধে মদিরালয় খোলা হবে এবং অবৈধ মদের চোরাচালান হবে। অনুমতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। চিনি, গম অথবা দুধের জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যকতা হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় এমন কার্য না করতে, যার ফলে পারমার্থিক জীবন ও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তাই বৈদিক প্রথায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পন্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও, চরমে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে। বৈদিক সভ্যতা আমাদেরকে শাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান প্রদান করে, এবং আমরা যদি শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করি, তা হলে আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা চরিতার্থ হবে, এবং সেই সঙ্গে আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারব।

শ্লোক ৩৫

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে ।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অপি**—ও; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে; **আত্যন্তিকতয়া**—সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ; **ইষ্যতে**—সেভাবে গ্রহণ করে; **ত্রৈবর্গ্যঃ**—অন্য তিনটি বর্গ, যথা—ধর্ম, অর্থ ও কাম; **অর্থঃ**—পুরুষার্থ; **যতঃ**—যা থেকে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **কৃত-অন্ত**—মৃত্যু; **ভয়**—ভয়; **সংযুতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

চতুর্বর্গের মধ্যে—অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে, মোক্ষকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। অন্য তিনটি বর্গ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে, মৃত্যুর দ্বারা বিনাশশীল।

তাৎপর্য

মোক্ষকে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করা উচিত, এমন কি অন্য তিনটি বর্গ বর্জন করেও তা গ্রহণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই সূত গোস্বামী সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতির সাফল্যের ভিত্তিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে মন্দিরে অথবা গির্জায় গিয়ে ভগবানের কাছে ধর্না দিই। অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ নয়। সব কিছুই এমনভাবে সামঞ্জস্য-সাধন করতে হয়, যাতে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। তাই এই শ্লোকে মুক্তি বা *মোক্ষের* উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অন্য তিনটি বর্গ জড়-জাগতিক এবং তাই বিনাশশীল। আমরা যদি এই জীবনে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমাই এবং বহু জড় বিষয় সংগ্রহ করি, তা সবই মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মৃত্যুরূপে পরমেশ্বর ভগবান শেষ পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সব কিছু হরণ করে নেন। মূর্খতাবশত আমরা সেই কথা বিচার করে দেখি না। মূর্খতাবশত আমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই, এমন কি আমরা বিচার করেও দেখি না যে, ধর্ম, অর্থ ও কামের দ্বারা অর্জিত সব কিছু মৃত্যু হরণ করে নেবে। ধর্মের দ্বারা, অথবা পুণ্যকর্মের দ্বারা আমরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা ধর্ম,

অর্থ ও কাম—এই *ত্রৈবর্গ্য* বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু মুক্তির উদ্দেশ্য বর্জন করতে পারি না। মুক্তি সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে— *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্মনৈতি* । মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই দেহ ত্যাগ করার পর অন্য আর একটি জড় দেহ গ্রহণ করতে হয় না। নির্বিশেষবাদীদের কাছে মুক্তি মানে হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা *মোক্ষ* নয়, কারণ সেই নির্বিশেষ অবস্থা থেকে তাকে পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হতে হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। অতএব মূল কথাটি হচ্ছে যে, পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে, আমাদের ভগবদ্ধামে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত, যার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভের অভিলাষী, তাদের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

শ্লোক ৩৬

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু ।
ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্ ॥ ৩৬ ॥

পরে—জীবনের উচ্চতর স্থিতিতে; **অবরে**—জীবনের নিম্নতর অবস্থায়; **চ**—এবং; **যে**—যারা সকলে; **ভাবাঃ**—ধারণা; **গুণ**—ভৌতিক গুণ; **ব্যতিকরাৎ**—মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা; **অনু**—অনুসরণ করে; **ন**—কখনই না; **তেষাম্**—তাদের; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান হয়; **ক্ষেমম্**—সংশোধন; **ঈশ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিধ্বংসিত**—বিনষ্ট; **আশিষাম্**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

আমরা নিম্নতর স্তরের জীবন থেকে উচ্চতর স্তরের জীবনের পার্থক্য নিরূপণ করে তাকে আশীর্বাদ বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভেদভাব জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই সমস্ত অবস্থার কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, কারণ পরম নিয়ন্তার দ্বারা তা সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

এই সংসারে আমরা উচ্চতর স্তরের জীবনকে আশীর্বাদ বলে মনে করি এবং নিম্নতর স্তরের জীবনকে অভিশাপ বলে মনে করি। 'উচ্চ' ও 'নীচ'-এর পার্থক্য ততক্ষণই

থাকে, যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মিথষ্ক্রিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমাদের সৎ কর্মের দ্বারা আমরা উচ্চতর লোকে অথবা উচ্চতর স্তরের জীবন প্রাপ্ত হই (যথা—বিদ্যা, দৈহিক সৌন্দর্য ইত্যাদি)। এগুলি পুণ্য কর্মের ফল। তেমনই, পাপকর্মের ফলে আমরা অশিক্ষিত হই, কুৎসিত শরীর লাভ করি, এবং দারিদ্র্য জীবন যাপন করি। কিন্তু জীবনের এই সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কিন্তু, সমগ্র জগৎ যখন লয় হয়ে যাবে, তখন এই সমস্ত গুণের ক্রিয়া আর থাকবে না। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ভগবান তাই বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রগতির দ্বারা অথবা ধার্মিক জীবন যাপনের দ্বারা—মহাযজ্ঞ অথবা সকাম কর্মের দ্বারা—আমরা যদি সর্বোচ্চ লোকেও উন্নীত হই, তা হলেও প্রলয়ের সময় এই সমস্ত উচ্চতর লোক এবং সেখানকার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। এই শ্লোকে *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরম নিয়ন্তার দ্বারা এই সমস্ত আশীর্বাদ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমাদের কেউই রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের দেহ, এই লোকেই হোক অথবা অন্য লোকেই হোক, ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং পুনরায় আমাদের কোটি কোটি বছর ধরে মহাবিষ্ণুর শরীরে অচেতন অবস্থায় থাকতে হবে। তার পর আবার যখন সৃষ্টির প্রকাশ হবে, তখন আমরা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, পুনরায় আমরা আমাদের কার্যকলাপ শুরু করব। তাই কেবল উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়েই, আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে, চিৎ-জগতে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় লাভের জন্য। সেটিই আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। উচ্চ অথবা নীচ, জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে সব কিছুই সমস্তরের বলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তার ফলে আমরা পূর্ণ জ্ঞানময়, আনন্দময় ও চিন্ময় কার্যকলাপের নিত্য আশীর্বাদ লাভ করতে পারব।

সুনিয়ন্ত্রিত মানব সমাজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উন্নতিবিধান করে। মানব সমাজের পক্ষে ধর্ম অত্যন্ত আবশ্যক। ধর্মবিহীন মানব-সমাজ কেবল পশুর সমাজ। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

যখন ধর্ম, অর্থ ও কামের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমন্বয় সাধন হয়, তখন এই জগতের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির থেকে মুক্তি সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এই কলিযুগে ধর্ম ও মোক্ষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে আগ্রহী। তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও, মানব-সমাজের আচরণ প্রায় পশুর মতো হয়ে গেছে। সব কিছু যখন উৎকটভাবে পাশবিক হয়ে যায়, তখন প্রলয় হয়। এই প্রলয়কে *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্*- রূপে গ্রহণ করা উচিত। ভগবৎ প্রদত্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশীর্বাদ চরমে ধ্বংসের মাধ্যমে লয় হয়ে যাবে। কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন, এবং তাঁর একমাত্র কাজ হবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের সংহার করা। সেই সংহার সাধনের পর, পুনরায় স্বর্ণযুগ শুরু হবে। তাই আমাদের জানা উচিত যে, আমাদের জড়-জাগতিক সমস্ত কার্য ঠিক শিশুদের খেলার মতো। শিশুরা সমুদ্রের তীরে খেলা করে, এবং তাদের পিতা সেখানে বসে দেখেন, শিশুরা কিভাবে বালি দিয়ে ঘরবাড়ি, দেওয়াল ইত্যাদি বানিয়ে খেলা করছে, কিন্তু অবশেষে পিতা তাঁর শিশুদের ঘরে ফিরে আসতে বলবেন। তখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যে-সমস্ত মানুষ শিশুসুলভ অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত, ভগবান কখনও কখনও তাদের উপর অনুগ্রহ করে, তাদের নির্মিত বস্তু ধ্বংস করে দেন।

ভগবান বলেছেন—*যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ* । ভগবান যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছেন যে, যখন তিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য হরণ করে নেন, তা তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষ কৃপার প্রদর্শন। তাই সাধারণত দেখা যায় যে, জড়-জাগতিক বিচারে বৈষ্ণবেরা খুব একটা ঐশ্বর্যশালী হন না। বৈষ্ণব বা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যখন জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের চেষ্টা করেন এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার অভিলাষ করেন, তখন তাঁর ভক্তি প্রতিহত হয়। তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে, ভগবান তাঁর তথাকথিত সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য নষ্ট করে দেন। ভক্ত তখন অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টায় বার বার নিরাশ হয়ে, অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রকার কার্যও *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* বলে মনে করা উচিত, যার ফলে ভগবান জড় ঐশ্বর্য নষ্ট করে দেন, কিন্তু পারমার্থিক উপলব্ধির দ্বারা তাঁকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন। আমাদের প্রচারকার্যে কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, বিষয়াসক্ত মানুষেরা আমাদের কাছে এসে প্রণতি নিবেদন করে আশীর্বাদ

ভিক্ষা করে। তারা আরও বেশি জড় ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি এই জড় ঐশ্বর্য প্রতিহত হয়, তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আর ভক্তদের প্রণাম করবে না। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনেই সর্বদা আগ্রহী। তারা সাধুদের অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের প্রচার-কার্যের জন্য কিছু দান করে, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান সেই ভক্তকে তাঁর জড়-জাগতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে বাধ্য করেন। ভগবান যেহেতু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের আশীর্বাদ প্রদান করেন না, তাই মানুষ সাধারণত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে ভয় পায়। কারণ তারা মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবেরা জড় ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষেরা শিবের পূজা করে অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রভূত সুযোগ লাভ করে, কারণ শিব হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষা দুর্গাদেবীর পতি। শিবের কৃপায় শিবভক্তরা দুর্গাদেবীর আশীর্বাদ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যেমন রাবণ ছিল মস্ত বড় শিব উপাসক ও শিবের ভক্ত, এবং তার ফলে সে দুর্গাদেবীর এমন কৃপালাভ করেছিল যে, তার সমগ্র রাজধানী সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে, এবং পুরাণে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সেটি ছিল রাবণের রাজধানী। কিন্তু সেই রাজধানী রামচন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই প্রকার ঘটনা অধ্যয়নের ফলে, আমরা *ঈশ-বিধ্বংসিতাশিষাম্* শব্দটির পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করেন না, কারণ তার ফলে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে পুনরায় এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের ফলে, রাবণের মতো ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সীতাদেবীকে হরণ করার দুঃসাহস করেছিল। সে মনে করেছিল যে, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিকে সে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার কর্মের দ্বারা রাবণ *বিধ্বংসিত*, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়েছিল। বর্তমান মানব-সভ্যতা অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে, এবং তাই ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৩৭

তত্ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাং চ
দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্ ।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি ॥ ৩৭ ॥

তৎ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **নর-ইন্দ্র**—হে শ্রেষ্ঠ রাজন্; **জগতাম্**—জঙ্গমের; **অথ**—অতএব; **তস্থুষাম্**—স্থাবর; **চ**—ও; **দেহ**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **অসু**—প্রাণবায়ু; **ধিষণা**—বিবেচনার দ্বারা; **আত্মভিঃ**—আত্ম-উপলব্ধি; **আবৃতানাম্**—যারা এহভাবে আবৃত; **যঃ**—যিনি; **ক্ষেত্র-বিৎ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **তপতয়া**—বশীভূত করার দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিশ্বক্**—সর্বত্র; **আবিঃ**—প্রকাশিত; **প্রত্যক্**—প্রতিটি রোমে; **চকাস্তি**—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তম্**—তাঁকে; **অবেহি**—উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর; **সঃ অস্মি**—আমি সেই।

অনুবাদ

সনৎকুমার রাজাকে উপদেশ দিলেন—অতএব, হে পৃথু মহারাজ, যিনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রতিটি জীবের শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে বিরাজ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করুন। জীবাত্মা স্থূল জড় শরীর এবং প্রাণ ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সকলের হৃদয়ে ব্যষ্টি আত্মার সঙ্গে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার চেষ্টা করার মাধ্যমে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা। ব্যষ্টি জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানের দ্বারা আবৃত দেহের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুশীলন। পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে—নির্বিশেষবাদ ও ভগবদ্ভক্তি। নির্বিশেষবাদীরা চরমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জীব ও পরমব্রহ্ম এক, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা সবিশেষবাদীরা উপলব্ধি করেন যে, যেহেতু পরম সত্য হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং জীব হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত, তাই জীবের

কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেবা করা। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে *তত্ত্বমসি* —'তুমি তা' এবং *সোঽহম্* —'আমি তা'। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, এই মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরম সত্য ও জীব এক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের বিচারে এই মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই গুণগতভাবে এক। *তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম* । পরমেশ্বর ও জীব উভয়েই ব্রহ্ম। তা হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ও নিজেকে জানা। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় এই অমূল্য জীবনের অপচয় করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে *ক্ষেত্রবিৎ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২) করা হয়েছে— *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে* । এই দেহকে বলা হয় *ক্ষেত্র*, এবং এই দেহের মালিকদের (দেহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উভয়কেই বলা হয় *ক্ষেত্রবিৎ* । কিন্তু এই দুই প্রকার *ক্ষেত্রবিৎ* - এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এক *ক্ষেত্রবিৎ* পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিচালনা করছেন। আমরা যখন যথাযথভাবে পরমাত্মার নির্দেশ গ্রহণ করি, তখন আমাদের জীবন সার্থক হয়। তিনি অন্তর থেকে এবং বাইরে থেকে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্তর থেকে তিনি *চৈত্যগুরু* রূপে নির্দেশ দিচ্ছেন। পরোক্ষভাবে বাইরে শ্রীগুরুরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেও তিনি জীবদের সাহায্য করছেন। উভয়ভাবেই ভগবান জীবদের পরিচালিত করছেন, যাতে তারা তাদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সমাপ্ত করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। যে-কোন ব্যক্তি দেহের অভ্যন্তরে আত্মা ও পরমাত্মাকে দেখতে পারেন, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত এঁরা দুজনে শরীরের ভিতরে বিরাজ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর উজ্জ্বল ও সজীব থাকে। কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা স্থূল শরীর ত্যাগ করা মাত্রই, তা তৎক্ষণাৎ পচতে শুরু করে। যিনি আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত, তিনি মৃত দেহ ও জীবন্ত দেহের প্রকৃত পার্থক্য এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করা উচিত। এইভাবে জ্ঞানের উন্নতি-সাধনের ফলে, মুক্তি ও জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, কেউ যদি তথাকথিত জাগতিক কর্তব্যসমূহ পরিত্যাগ করে মুক্তির পথ অবলম্বন করেন, তা হলে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে-ব্যক্তি মুক্তির পথ অবলম্বন

না করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে, তার সর্বনাশ হয়। সেই সম্পর্কে ব্যাসদেবের সঙ্গে নারদ মুনির উপদেশ অত্যন্ত উপযুক্ত—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৭)

কেউ যদি আবেগের বশে অথবা অন্য কোন কারণে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথচ জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনে অকৃতকার্য হয়ে, অভিজ্ঞতার অভাবে অধঃপতিত হয় তবুও তাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করেন, তার ফলে তাঁর কোন লাভ হয় না।

শ্লোক ৩৮

যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি
মায়া বিবেকবিধুতি স্রজি বাহিবুদ্ধিঃ ।
তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং
প্রত্যূঢ়কর্মকলিলপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥ ৩৮ ॥

যস্মিন্—যাতে; **ইদম্**—এই; **সৎ-অসৎ**—পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর বিভিন্ন শক্তি; **আত্মতয়া**—সমস্ত কার্য ও কারণের মূল হওয়ার ফলে; **বিভাতি**—প্রকাশ করেন; **মায়া**—মায়া; **বিবেক-বিধুতি**—বিচার ও বিবেচনার দ্বারা মুক্ত; **স্রজি**—রজ্জুতে; **বা**—অথবা; **অহি**—সর্প; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তম্**—তাঁকে; **নিত্য**—চিরকাল; **মুক্ত**—মুক্ত; **পরিশুদ্ধ**—নিষ্কলুষ; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **প্রত্যূঢ়**—চিন্ময়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **কলিল**—কলুষ; **প্রকৃতিম্**—চিন্ময় শক্তিতে অবস্থিত; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হই।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরের ভিতর কার্য ও কারণের সঙ্গে একাগ্রীভূত হয়ে, নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু যিনি বিবেকের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করেছেন,

এবং যার ফলে রজ্জুকে সর্প বলে মনে করার ভ্রম দূর হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমাত্মা চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত এবং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে ভগবান সমস্ত জড় কলুষের অতীত, এবং কেবল তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে মায়াবাদীদের যে সিদ্ধান্ত, তা এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে নিরস্ত হয়েছে। মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব ও পরমাত্মা এক, এবং তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মায়াবাদীদের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, এবং পার্থক্য আছে বলে যে অনুভূতি তা হচ্ছে মায়া। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, এটি ঠিক তেমনই। রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তটি সাধারণত মায়াবাদীরা দিয়ে থাকে। তাই বিবর্তবাদের সূচক এই শব্দগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি নিত্যমুক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরে রয়েছেন। সেই কথা *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। একই বৃক্ষে অবস্থিত দুটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা হয়েছে। তবুও পরমাত্মা মায়ার অতীত। মায়াশক্তিকে বলা হয় বহিরঙ্গা শক্তি, এবং জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সমন্বিত জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি জীব, উভয়েই ভগবানের শক্তি। যদিও শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, তবুও জীবাত্মা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করে যে, সে ও ভগবান এক।

এই শ্লোকে *প্রপদ্যে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা *ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত (১৮/৬৬)—*সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,* এই শ্লোকটির সম অর্থবাহী। অন্যত্র ভগবান বলেছেন—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। এই *প্রপদ্যে* অথবা *শরণং ব্রজ* পরমাত্মার কাছে জীবের শরণাগতির সূচক। ব্যষ্টি জীবাত্মা যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে। ভগবান যদিও ব্যষ্টি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, তবুও তিনি জীবাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ। যদিও মনে হয় যে, ভগবান ও জড়া প্রকৃতি এক, তবুও ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, তিনি যুগপৎ এক ও অভিন্ন। জড়া প্রকৃতি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং যেহেতু শক্তি শক্তিমান থেকে অভিন্ন, তাই মনে হয় যেন ভগবান ও জীবাত্মা এক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা জড়া

প্রকৃতির অধীন, এবং ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির অতীত। ভগবান যদি ব্যষ্টি জীবাত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ না হন, তা হলে তাঁর শরণাগত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। *প্রপদ্যে* শব্দটি ভগবদ্ভক্তির পন্থাসূচক। রজ্জু ও সর্প সম্বন্ধে ভক্তিবিহীন জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনই পরম সত্যকে জানা যায় না। তাই মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরম সত্যকে জানার প্রচেষ্টা থেকে ভগবদ্ভক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—চরণ; **পঙ্কজ**—পদ্ম; **পলাশ**—পাপড়ি অথবা অঙ্গুলি; **বিলাস**—ভোগ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **আশয়ম্**—বাসনা; **গ্রথিতম্**—গ্রন্থি; **উদ্গ্রথয়ন্তি**—সমূলে উৎপাটিত করে; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **তৎ**—তা; **বৎ**—সদৃশ; **ন**—কখনই না; **রিক্ত-মতয়ঃ**—ভগবদ্ভক্তি-বিহীন ব্যক্তিগণ; **যতয়ঃ**—অধিক থেকে অধিকতর প্রচেষ্টার দ্বারা; **অপি**—যদিও; **রুদ্ধ**—বন্ধ করেছে; **স্রোতঃ-গণাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের তরঙ্গ; **তম্**—তাঁকে; **অরণম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **ভজ**—প্রেমপূর্বক সেবা করুন; **বাসুদেবম্**—বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

যে-সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠির সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে সকাম কর্মের বাসনাস্বরূপ গ্রন্থির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই জ্ঞানী ও যোগী আদি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না। তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে যত্নবান তিন প্রকার অধ্যাত্মবাদী রয়েছেন—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তাঁরা সকলেই নদীর অন্তহীন তরঙ্গের মতো ইন্দ্রিয়ের

প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। নদীর তরঙ্গ অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয় এবং তা রোধ করা খুব কঠিন। তেমনই, জড়সুখ ভোগের বাসনার তরঙ্গ এতই প্রবল যে, তা ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই রোধ করা যায় না। ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা দিব্য আনন্দে এতই অভিভূত হন যে, তাঁর জড়সুখ ভোগের বাসনা আপনা থেকেই লুপ্ত হয়ে যায়। জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত না হওয়ার ফলে, বাসনার তরঙ্গের বিরুদ্ধে কেবল সংগ্রামই করে যায়। এই শ্লোকে তাদের *রিক্ত-মতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ভক্তিবিহীন'। অর্থাৎ, জ্ঞানী ও যোগীরা যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভ্রান্ত দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা অথবা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ রোধ করার কঠোর প্রচেষ্টায় আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। সেই সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)

এখানেও সেই বিষয়েই জোর দেওয়া হয়েছে। *ভজ বাসুদেবম্* বলতে বোঝায় যে, যিনি বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি অনায়াসে কামনার বৃত্তি রোধ করতে পারেন। মানুষ যদি কৃত্রিমভাবে বাসনার বৃত্তি রোধ করার চেষ্টা করে, তা হলে সে নিশ্চিতভাবে পরাভূত হবে। সেই কথাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সকাম কর্ম-বাসনারূপ বৃক্ষের মূল অত্যন্ত দৃঢ়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সেই বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত করা যায়, কারণ ভগবদ্ভক্তির বাসনা উন্নততর। উন্নত বাসনায় নিয়োজিত হলে, নিকৃষ্ট বাসনা বর্জন করা যায়। বাসনা ত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু নিকৃষ্ট বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবার বাসনা করা। জ্ঞানীরা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে, কিন্তু এই প্রকার বাসনাকেও কাম বলে বিবেচনা করা হয়। তেমনই, যোগীরা যোগসিদ্ধি লাভের বাসনা করে, এবং সেটিও কাম। আর ভক্তদের জড়সুখ ভোগের কোন প্রকার বাসনা থাকে না বলে তারা পবিত্র হয়। বাসনা ত্যাগ করার কোন রকম কৃত্রিম প্রচেষ্টা করা হয় না। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলির আশ্রয়ের বাসনা তখন চিন্ময় আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। এখানে কুমারগণ বলেছেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হচ্ছে সমস্ত আনন্দের চরম উৎস। তাই জড়সুখ ভোগের বাসনা রোধ করার ব্যর্থ প্রয়াস না করে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়

গ্রহণ করা কর্তব্য। যতক্ষণ পর্যন্ত জড়-জাগতিক সুখভোগের বাসনা ত্যাগ না করা যায়, ততক্ষণ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, নদীর তরঙ্গ অবিরত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে এবং তা রোধ করা যায় না, কিন্তু সেই নদী প্রবাহিত হচ্ছে সমুদ্রের দিকে। নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন সেই নদীর গতি বিপরীতমুখী হয় এবং নদীর দুকূল ছাপিয়ে যায়, তখন সমুদ্রের তরঙ্গ নদীর তরঙ্গ থেকে অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তেমনই, ভক্ত যখন তাঁর বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করেন, তখন জড় বাসনারূপ মরা নদীতে ভগবানের সেবারূপ বাসনার জোয়ার আসে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে যামুনাচার্য বলেছেন যে, যখন থেকে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের সেবা করার নব নব বাসনার স্রোত এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে, মৈথুন সুখের অবরুদ্ধ বাসনা তখন নিতান্তই নগণ্য হয়ে গেছে। এমন কি যামুনাচার্য বলেছেন যে, তিনি তখন সেই প্রকার বাসনার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (২/৫৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবা করার প্রেমময়ী বাসনার বিকাশের দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত জড় বাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারি।

শ্লোক ৪০

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি ।
তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥ ৪০ ॥

কৃচ্ছ্রঃ—ক্লেশদায়ক; **মহান্**—অত্যন্ত; **ইহ**—এখানে (এই জীবনে); **ভব-অর্ণবম্**—সংসার-সমুদ্র; **অপ্লব-ঈশাম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি যে অভক্তরা; **ষট্-বর্গ**—ছয় ইন্দ্রিয়; **নক্রম্**—হাঙর; **অসুখেন**—অত্যন্ত অসুবিধা সহকারে; **তিতীর্ষন্তি**—উত্তীর্ণ হয়; **তৎ**—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভজনীয়ম্**—আরাধ্য; **অঙ্ঘ্রিম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **কৃত্বা**—করে; **উড়ুপম্**—নৌকা; **ব্যসনম্**—সব রকম বিপদ; **উত্তর**—উত্তীর্ণ হোন; **দুস্তর**—অত্যন্ত কঠিন; **অর্ণম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ঙ্কর নক্র-মকরসংকুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করে, তবুও আমি আপনাকে বলছি যে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মরূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দুস্তর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে আপনি অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারবেন।

তাৎপর্য

এখানে জড় সংসারকে অজ্ঞানের বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সমুদ্রের আর একটি নাম বৈতরণী। বৈতরণী সমুদ্রে, যা হচ্ছে কারণ সমুদ্র, সেখানে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড খেলার বলের মতো ভাসছে। এই সমুদ্রের অপর পারে রয়েছে বৈকুণ্ঠলোক, যার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ* । এইভাবে এই জড়া প্রকৃতির অতীত এক নিত্য বিরাজমান চিন্ময় প্রকৃতি রয়েছে। যদিও কারণ সমুদ্রের সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি বার বার লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক নিত্য বিরাজমান এবং সেগুলির কখনও ধ্বংস হয় না। মনুষ্য-জীবন জীবকে অজ্ঞানের সমুদ্ররূপী জড় ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে চিদাকাশে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। এই সমুদ্র অতিক্রম করার যদিও নানা প্রকার উপায় অথবা নৌকা রয়েছে, কিন্তু কুমারেরা পৃথু মহারাজকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বনে অনিচ্ছুক অভক্তরা অন্যান্য উপায়ে (কর্ম, জ্ঞান ও যোগ) এই সমুদ্র অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার ফলে তাদের মহাক্লেশই কেবল লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে তারা সেই ক্লেশ উপভোগে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে কখনই পারে না। অভক্তরা যে সেই সমুদ্র পার হতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই, আর যদি তারা পার হয়ও, সেইজন্য তাদের কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। পক্ষান্তরে, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাপরায়ণ এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনি এক অত্যন্ত নিরাপদ নৌকায় চড়ে সেই সমুদ্র অতিক্রম করছেন, এবং তিনি যে অত্যন্ত অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে সেই সমুদ্র অতিক্রম করবেন তা সুনিশ্চিত।

পৃথু মহারাজকে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করার নিমিত্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপী নৌকা গ্রহণ করার জন্য। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত

বিপজ্জনক বস্তুগুলির তুলনা করা হয়েছে সমুদ্রের হাঙ্গরের সঙ্গে। কেউ যদি অত্যন্ত সুদক্ষ সাঁতারুও হয়, তবুও হাঙ্গর যদি তাঁকে আক্রমণ করে, তা হলে তার বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, তথাকথিত বহু স্বামী ও যোগী ঘোষণা করে যে, তারা এই অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম এবং অন্যদেরও তা অতিক্রম করতে তারা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, তারা কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের শিকার হয়। তাদের অনুগামীদের এই অজ্ঞানের সমুদ্র অতিক্রম করতে সাহায্য করার পরিবর্তে, এই সমস্ত স্বামী ও যোগীরা কামিনী-কাঞ্চনরূপী মায়ার শিকার হয়, এবং সেই সমুদ্রের হাঙ্গরেরা তাদের গ্রাস করে।

শ্লোক ৪১

মৈত্রেয় উবাচ

স এবং ব্রহ্মপুত্রেণ কুমারেণাত্মমেধসা ।
দর্শিতাত্মগতিঃ সম্যক্প্রশস্যোবাচ তং নৃপঃ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **সঃ**—রাজা; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রহ্ম-পুত্রেণ**—ব্রহ্মার পুত্রের দ্বারা; **কুমারেণ**—কুমারদের একজনের দ্বারা; **আত্ম-মেধসা**—চিন্ময় জ্ঞানে পারঙ্গত; **দর্শিত**—দেখান হয়; **আত্ম-গতিঃ**—আধ্যাত্মিক উন্নতি; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **প্রশস্য**—আরাধনা করে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মার পুত্র আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে পূর্ণরূপে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে, পৃথু মহারাজ নিম্নলিখিত শব্দে তাঁদের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আত্ম-মেধসা* শব্দটির টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *আত্মনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *পরমাত্মনি* অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)। তাই যাঁর মন পূর্ণ কৃষ্ণচেতনায় কার্য করছে, তাঁকে বলা হয় *আত্ম-মেধাঃ* । এই শব্দটির বিপরীত

শব্দ হচ্ছে *গৃহমেধী* , অর্থাৎ যার বুদ্ধি সর্বদা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন। *আত্ম-মেধাঃ* সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করেন। যেহেতু ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, তাই তিনি পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পন্থা প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। *আত্মগতিঃ* শব্দটি কর্মের সেই পন্থার সূচক, যার দ্বারা মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে।

শ্লোক ৪২

রাজোবাচ

কৃতো মেঽনুগ্রহঃ পূর্বং হরিণার্তানুকম্পিনা ।
তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যূয়মাগতাঃ ॥ ৪২ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কৃতঃ**—করেছেন; **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—অহৈতুকী কৃপা; **পূর্বম্**—পূর্বে; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **আর্ত-অনুকম্পিনা**—দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **তম্**—তা; **আপাদয়িতুম্**—তা প্রতিপন্ন করতে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভগবন্**—হে শক্তিমান; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **আগতাঃ**—এখানে এসেছেন।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে ব্রাহ্মণ! হে শক্তিমান! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আপনারা আমার গৃহে আসবেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ পূর্ণ করার জন্য আপনারা সকলে এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু সেই মহা-যজ্ঞস্থলে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই কুমারেরা এসে রাজাকে উপদেশ দান করবেন। তাই পৃথু মহারাজ ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করেছিলেন, এবং ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে কুমারেরা যখন সেখানে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি তাঁর কোন ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন। তেমনই, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর মহিমান্বিত নাম এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

উভয়ই পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার বাসনা করেছিলেন, এবং আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি* —"হে কৌন্তেয়, দৃপ্ত কণ্ঠে তুমি ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) ভগবান নিজেই সেই কথা ঘোষণা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি অর্জুনের মাধ্যমে সেই ঘোষণাটি করতে চেয়েছিলেন, এবং এইভাবে তিনি দ্বিগুণভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হবে না। ভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের জন্য ভগবান বহু প্রতিজ্ঞা করেন। ভগবান যদিও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তবুও মানুষেরা সাধারণত তাঁর সেবা করতে চায় না। তাই সম্পর্কটি অনেকটা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো; পুত্র পিতাকে ভুলে গেলেও অথবা অবহেলা করলেও, পিতা সর্বদাই পুত্রের কল্যাণসাধনে উৎসুক থাকেন। *অনুকম্পিনা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ; ভগবান জীবের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, অধঃপতিত জীবদের কল্যাণের জন্য তিনি স্বয়ং এই জড় জগতে আসেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।"
(*ভগবদ্গীতা* ৪/৭)

এইভাবে অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে ভগবান বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লোকে আবির্ভূত হয়েছিলেন; অসুরেরা যখন অসহায় পশুদের হত্যা করছিল, তখন সেই পশুদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে বুদ্ধদেব এসেছিলেন; প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, ভগবান এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, তাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং আসেন, অথবা তাঁর ভক্ত ও সেবকদের প্রেরণ করেন। তাই সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল-সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করা, এবং শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তদের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* নির্ভেজাল উপদেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ৪৩

নিষ্পাদিতশ্চ কার্ৎস্ন্যেন ভগবদ্ভির্ঘৃণালুভিঃ ।
সাধূচ্ছিষ্টং হি মে সর্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥ ৪৩ ॥

নিষ্পাদিতঃ চ—আদেশ যথাযথভাবে পালন করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—পূর্ণরূপে; **ভগবদ্ভিঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিদের দ্বারা; **ঘৃণালুভিঃ**—অত্যন্ত দয়ালুর দ্বারা; **সাধু-উচ্ছিষ্টম্**—সাধুদের উচ্ছিষ্ট; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার; **সর্বম্**—সব কিছু; **আত্মনা**—হৃদয় ও আত্মা; **সহ**—সঙ্গে; **কিম্**—কি; **দদে**—দেব।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আপনারা ভগবানেরই মতো কৃপালু, তাই আপনারা তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আপনাদের কিছু দান করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, তা সাধুদের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ। অতএব আপনাদের আমি কি দান করব?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধূচ্ছিষ্টম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজ ভৃগু আদি মহর্ষিদের কাছ থেকে তাঁদের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ তাঁর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা বেণের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কোন জনপ্রিয় রাজা ছিল না। তার ফলে নানা প্রকার দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, এবং তখন ভৃগুর নেতৃত্বে মহান ঋষিরা মৃত রাজা বেণের শরীর থেকে পৃথু মহারাজের দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যেহেতু মহর্ষিদের কৃপায় তাঁর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি কুমারদের কাছে সেই রাজ্য বণ্টন করতে চাননি। পিতা যদি কৃপাপূর্বক তাঁর পুত্রকে তাঁর উচ্ছিষ্ট দান করেন, সেই উচ্ছিষ্ট পুনরায় পিতাকে প্রদান করা পুত্রের কর্তব্য নয়। পৃথু মহারাজের অবস্থা অনেকটা সেই রকম ছিল। তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তা সবই পিতৃসদৃশ সাধুদের উচ্ছিষ্ট এবং তাই তিনি পুনরায় কুমারদের তা নিবেদন করতে চাননি। কিন্তু, পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর সব কিছুই কুমারদের দান করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারতেন। পরবর্তী শ্লোকে সেই বিষয়টি স্পষ্টিকৃত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

প্রাণা দারাঃ সুতা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ ।
রাজ্যং বলং মহী কোশ ইতি সর্বং নিবেদিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণাঃ—প্রাণ; **দারাঃ**—পত্নী; **সুতাঃ**—পুত্র; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **গৃহাঃ**—গৃহ; **চ**—ও; **স**—সহ; **পরিচ্ছদাঃ**—সমস্ত উপকরণ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বলম্**—শক্তি; **মহী**—ভূমি; **কোশঃ**—কোশ; **ইতি**—এইভাবে; **সর্বম্**—সব কিছু ; **নিবেদিতম্**—অর্পণ করলাম।

অনুবাদ

রাজা বললেন—অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আমার জীবন, পত্নী, পুত্র, গৃহ, গৃহস্থালির সমস্ত সামগ্রী, আমার রাজ্য, বল, ভূমি এবং বিশেষরূপে আমার রাজকোষ সবই আমি আপনাদের নিবেদন করলাম।

তাৎপর্য

কোন কোন পাঠে *দারাঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়নি, তার পরিবর্তে *রায়ঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ধনসম্পদ'। ভারতবর্ষে এখনও অনেক ধনী ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা রাজ্যের দ্বারা *রায়* উপাধিতে পরিচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত রামানন্দ রায়রূপে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন মাদ্রাজের রাজ্যপাল এবং অত্যন্ত ধনী। এখনও রায় বাহাদুর, রায় চৌধুরী ইত্যাদি রায় উপাধিধারী বহু ব্যক্তি রয়েছেন। *দারাঃ* বা পত্নীকে ব্রাহ্মণদের নিবেদন করা অনুমোদিত নয়। দান গ্রহণের যোগ্য পাত্রে সব কিছু দান করা যায়, কিন্তু কোথায়ও পত্নীকে দান করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না; তাই এখানে *দারাঃ* শব্দটির স্থানে *রায়ঃ* পাঠটি অধিক উপযুক্ত। যেহেতু পৃথু মহারাজ কুমারদের সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন, তাই *কোশঃ* শব্দটির পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। রাজা ও মহারাজেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কোষ রাখতেন যাকে রত্নভাণ্ড বলা হত। রত্নভাণ্ড এক বিশেষ প্রকার কোষাগার যাতে বালা, কণ্ঠহার ইত্যাদি বিশেষ রত্নালঙ্কার, যা নাগরিকেরা রাজাকে প্রদান করতেন, তা রাখা হত। যে-কোষে কর ও খাজনা রাখা হয়, তা থেকে পৃথকভাবে এই সমস্ত রত্নালঙ্কার রাখা হত। এইভাবে পৃথু মহারাজ তাঁর ব্যক্তিগত মণিরত্নও কুমারদের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, রাজার সমস্ত সম্পত্তি ছিল ব্রাহ্মণদের, এবং পৃথু মহারাজ রাজ্যের কল্যাণের জন্য কেবল তা ব্যবহার করছিলেন, যদি তা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি হয়, তা হলে সেগুলি আবার তাদের নিবেদন করা কি করে সম্ভব? সেই সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, সেটি ঠিক ভৃত্যের প্রভুকে খাদ্য নিবেদন করার মতো। খাদ্য প্রভুর, কারণ তিনি তা খরিদ করেছেন, কিন্তু ভৃত্য আহার তৈরি করে, তা প্রভুর গ্রহণযোগ্য করে তাঁকে তা নিবেদন করে। এইভাবে পৃথু মহারাজের যা কিছু তা সবই তিনি কুমারদের নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ ।
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ৪৫ ॥

সৈনা-পত্যম্—সেনাপতির পদ; **চ**—এবং; **রাজ্যম্**—রাজপদ; **চ**—এবং; **দণ্ড**—শাসন; **নেতৃত্বম্**—নেতৃত্ব; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং; **সর্ব**—সমস্ত; **লোক-অধিপত্যম্**—গ্রহলোকের আধিপত্য; **চ**—এবং; **বেদ-শাস্ত্র-বিৎ**—যিনি বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম অবগত; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

যেহেতু বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিই কেবল সেনাপতি, রাজ্যশাসক, দণ্ডদাতা ও সমগ্র গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই পৃথু মহারাজ সব কিছু কুমারদের নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুমারদের মতো সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য, রাষ্ট্র অথবা সাম্রাজ্য পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য। যখন রাজতন্ত্র সমগ্র পৃথিবী শাসন করছিল, তখন সাধু ও ব্রাহ্মণদের পরিষদের দ্বারা রাজা পরিচালিত হতেন। রাজ্যের শাসক রাজা ব্রাহ্মণদের দাসরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতেন। এমন নয় যে, রাজা অথবা ব্রাহ্মণেরা স্বৈরাচারী ছিলেন। এমন কি তাঁরা তাঁদের রাজ্য নিজের সম্পত্তি বলেও মনে করতেন না। রাজারা বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারঙ্গত ছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা *ঈশোপনিষদের* নির্দেশ, *ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্*, অর্থাৎ সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, সেই কথা খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন *সর্বলোক-মহেশ্বরম্* । তাই কেউই রাজ্যের মালিক হওয়ার দাবি করতে পারে না। রাজা, রাষ্ট্রপতি অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা মালিক নন, তাঁরা হচ্ছেন দাস।

বর্তমান যুগে, রাজা অথবা রাষ্ট্রপতিরা ভুলে গেছেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের দাস। পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেদের জনসাধারণের দাস বলে মনে করেন। বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করে যে, তারা হচ্ছে জনগণের সরকার, কিন্তু এই প্রকার সরকার *বেদে* অনুমোদিত হয়নি। *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে রাজ্যশাসন করা উচিত, এবং তাই ভগবানের প্রতিনিধিদের

দ্বারা তা শাসিত হওয়া উচিত। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (*বেদ-শাস্ত্র-বিদ্-অর্হতি*), অর্থাৎ উচ্চ রাজপদগুলি তাঁদেরই দেওয়া উচিত, যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রে পারঙ্গত। *বেদে* বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাজা, সেনাপতি, সৈনিক ও নাগরিকদের কিভাবে আচরণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান যুগে বহু তথাকথিত দার্শনিক রয়েছে, যারা প্রামাণিক উদাহরণ না দিয়েই উপদেশ দেয়, এবং বহু নেতারা তাদের অবৈধ নির্দেশ অনুসরণ করে। তার ফলে মানুষ সুখী নয়।

কার্ল মার্ক্স-এর বর্তমান সাম্যবাদ যা সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি অনুসরণ করছে, তা পূর্ণ নয়। বৈদিক সাম্যবাদ অনুসারে, রাজ্যে কেউ কখনও অভুক্ত থাকে না। বর্তমানে অনেক আজেবাজে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা ক্ষুধার্তদের খাদ্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু এই অর্থ নিঃসন্দেহে অপব্যবহার করা হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, সরকারের এমনভাবে সব কিছুর আয়োজন করা উচিত, যাতে কারও অনাহারে থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহস্থদের দেখা উচিত যে, যাতে একটি টিকটিকি এবং সাপও অনাহারে না থাকে। তাদেরও আহার প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে অনাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সব কিছু হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি এবং তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যে, সকলেরই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য মেলে। *বেদে* (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) বলা হয়েছে *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* । পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন, এবং অনাহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি অনাহারে থাকে, তবে তার কারণ হচ্ছে তথাকথিত শাসক, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির কুশাসন ব্যবস্থা।

অতএব, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা *বেদশাস্ত্রবিৎ* নন, তাঁদের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ইত্যাদি হওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়ানো উচিত নয়। পুরাকালে রাজারা ছিলেন *রাজর্ষি* , অর্থাৎ, যদিও তাঁরা রাজারূপে রাজ্যশাসন করতেন, তবুও কখনও বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ লঙ্ঘন করতেন না এবং মহান সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় রাজ্যশাসন করতেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে, বর্তমান রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও মুখ্য সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের পদের অযোগ্য, কারণ তাঁরা বৈদিক প্রশাসনিক জ্ঞানে পারঙ্গত নন এবং মহান সাধু ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশ তাঁরা গ্রহণ করেন না। *বেদ* ও ব্রাহ্মণদের আদেশ অবজ্ঞা করার ফলে, পৃথু মহারাজের পিতা ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তাই পৃথু মহারাজ ভালভাবে জানতেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সাধু ও ব্রাহ্মণদের সেবকরূপে এই পৃথিবী শাসন করা।

শ্লোক ৪৬

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বম্—নিজের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **স্বম্**—নিজের; **বস্তে**—বস্ত্র; **স্বম্**—নিজের; **দদাতি**—দান করেন; **চ**—এবং; **তস্য**—তাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **অন্নম্**—অন্ন; **ভুঞ্জতে**—আহার করে; **ক্ষত্রিয়-আদয়ঃ**—সমাজের ক্ষত্রিয় আদি অন্য বর্ণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের কৃপায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা তাদের আহার প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণেরাই কেবল তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের নিজেদের বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি অপরকে দান করেন।

তাৎপর্য

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় মন্ত্রে ভগবানের পূজা করা হয়, যা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ব্রাহ্মণদের পূজনীয় বলে মনে করেন। সকলেই ভগবানের পূজা করে, কিন্তু অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করা, কারণ ব্রাহ্মণদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে শব্দ-ব্রহ্ম বা বৈদিক জ্ঞান প্রচার করা। যখনই বৈদিক জ্ঞানের প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণদের অভাব হয়, তখন মানব-সমাজে সংকট দেখা দেয়। যেহেতু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবক, তাই তাঁরা অন্য কারোর উপর নির্ভর করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই জগতের সব কিছুই ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি, এবং দৈন্যবশত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়, অথবা রাজা এবং বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন। সব কিছুই ব্রাহ্মণদের, কিন্তু ক্ষত্রিয় সরকার ও ব্যবসায়ীরা তত্ত্বাবধায়কের মতো তার তত্ত্বাবধান করেন, এবং যখন ব্রাহ্মণদের অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের তা সরবরাহ করা উচিত। সেটা অনেকটা ব্যাঙ্কে টাকা রাখার মতো এবং যিনি টাকা গচ্ছিত রাখেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে টাকা তুলে নিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের সেবায় রত থাকেন বলে বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয় সামলাবার জন্য তাঁদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে না, তাই ক্ষত্রিয়রা অথবা রাজারা ধনসম্পদ আগলে রাখতেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে সেই সম্পদ তাঁদের এনে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবেরা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন

করেন না; তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধনই খরচ করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দান করার কোন অধিকার নেই, কারণ তাদের যা কিছু তা সবই ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি। তাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দান করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত অভাব, এবং যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করছে না, তাই পৃথিবীর অবস্থা এত সংকটজনক হয়ে উঠেছে।

এই শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা কেবল ব্রাহ্মণের কৃপাতেই আহার করে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্জিত কোন বস্তু তাদের আহার করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা জানেন কি আহার করা উচিত, এবং তাঁরা এমন কোন বস্তু আহার করেন না, যা প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি। তাঁরা কেবল প্রসাদ বা ভগবানকে নিবেদিত খাদ্য আহার করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ আহার করা উচিত, যা ব্রাহ্মণদের কৃপায় তারা পেয়ে থাকে। কসাইখানা খুলে মাংস, মাছ অথবা ডিম আহার করা অথবা মদ্যপান করা, কিংবা এই সমস্ত উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা তাদের উচিত নয়। বর্তমান যুগে, যেহেতু ব্রাহ্মণদের নির্দেশনায় সমাজ পরিচালিত হচ্ছে না, তাই সমস্ত জনসাধারণ কেবল পাপকর্মে মগ্ন হয়েছে। তার ফলে, সকলেই প্রকৃতির নিয়মে যথাযোগ্য দণ্ডভোগ করছে। এটিই হচ্ছে কলিযুগের অবস্থা।

শ্লোক ৪৭

যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ
একান্ততো নিগমিভিঃ প্রতিপাদিতা নঃ ।
তুষ্যন্ত্বদভ্রকরুণাঃ স্বকৃতেন নিত্যং
কো নাম তৎপ্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

যৈঃ—যাঁদের দ্বারা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গতিঃ**—প্রগতি; **আত্ম-বাদে**—আধ্যাত্মিক বিচার; **একান্ততঃ**—পূর্ণ উপলব্ধিতে; **নিগমিভিঃ**—বৈদিক প্রমাণের দ্বারা; **প্রতিপাদিতা**—নিশ্চিতরূপে নিরূপিত; **নঃ**—আমাদের; **তুষ্যন্তু**—সন্তুষ্ট হন; **অদভ্র**—অন্তহীন; **করুণাঃ**—কৃপা; **স্ব-কৃতেন**—আপনার নিজের কার্যকলাপের দ্বারা; **নিত্যম্**—শাশ্বত; **কঃ**—কে; **নাম**—কেউ নয়; **তৎ**—তা; **প্রতিকরোতি**—প্রতিকার করে; **বিনা**—ব্যতীত; **উদ-পাত্রম্**—অঞ্জলিভরে জল নিবেদন করা।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ বললেন—যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিশ্লেষণ করে অন্তহীন সেবা করেছেন, এবং বৈদিক প্রমাণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-সমন্বিত যাঁদের ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অঞ্জলি ভরে কেবল জল দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি দেওয়ার আছে? এই প্রকার মহাপুরুষেরা তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হতে পারেন, যা তাঁদের অন্তহীন করুণার ফলে, মানব-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতে মহাপুরুষেরা মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য সেবা করতে অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ থেকে বড় সেবা আর নেই। সমস্ত জীব মায়াশক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের প্রকৃত পরিচয় ভুলে গিয়ে, তারা শান্তিপূর্ণ জীবনের অন্বেষণে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে জড় জগতে বিচরণ করে। যেহেতু তাদের আত্ম-উপলব্ধির স্বল্প জ্ঞানও নেই, তাই তারা মনের ও দেহের সুখের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও শান্তি পায় না। কুমার, নারদ, প্রহ্লাদ, জনক, শুকদেব গোস্বামী ও কপিলদেব আদি মহাজনদের অনুগামী বৈষ্ণব আচার্যরা এবং তাঁদের সেবকেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করে মানব-সমাজের এক অপূর্ব সেবা সম্পাদন করতে পারেন। এই জ্ঞান মানব-সমাজের জন্য এক অপূর্ব আশীর্বাদ।

কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান এমনই এক মহান উপহার, যার প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। তাই পৃথু মহারাজ কুমারদের অনুরোধ করেছেন যে, জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার পরোপকারের কার্যই তাঁদের সন্তোষের কারণস্বরূপ। রাজা দেখেছিলেন যে, তাঁদের সেই অতি মহৎ কার্যকলাপের জন্য তাঁদের প্রসন্নতা-বিধানের আর অন্য কোন উপায় ছিল না। *বিনোদপাত্রম্* শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ হয় *বিনা* ও *উদপাত্রম্* , অথবা একটি শব্দরূপে তার অর্থ হচ্ছে '*বিদূষক* '। বিদূষকের কার্য হচ্ছে কেবল লোক হাসানো, এবং যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজ্ঞান প্রদানকারী শিক্ষককে প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করে, তার অবস্থা ঠিক একজন বিদূষকের মতো হাস্যকর, কারণ সেই ঋণ কখনও শোধ করা সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও উপকারক হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষদের মূল কৃষ্ণচেতনায় জাগরিত করেন।

শ্লোক ৪৮

মৈত্রেয় উবাচ

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ ।
শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেঽভবন্মিষতাং নৃণাম্ ॥ ৪৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **তে**—তাঁরা; **আত্ম-যোগ-পতয়ঃ**—ভক্তির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির উপদেষ্টাগণ; **আদি-রাজেন**—আদি রাজা (পৃথু) দ্বারা; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **শীলম্**—স্বভাব; **তদীয়ম্**—রাজার; **শংসন্তঃ**—প্রশংসা করে; **খে**—আকাশে; **অভবন্**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মিষতাম্**—যখন দেখছিলেন; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—এইভাবে পৃথু মহারাজের দ্বারা পূজিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা চার কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা রাজার গুণের প্রশংসা করতে করতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উত্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, দেবতারা কখনও পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করেন না। তাঁরা কেবল অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন। নারদ মুনি, কুমার আদি মহর্ষিদের অন্তরীক্ষে বিচরণের জন্য কোন রকম যানের আবশ্যকতা হয় না। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরাও বিনা যানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারেন; কারণ তাঁরা সব রকম যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধ এই প্রকার মহাপুরুষদের আর আজকাল পৃথিবীতে দেখা যায় না, কারণ এখনকার মানব-সমাজ তাঁদের উপস্থিতির যোগ্য নয়। কুমারগণ কিন্তু পৃথু মহারাজের চরিত্রের, তাঁর মহান ভক্তির এবং বিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যেভাবে তাঁদের পূজা করেছিলেন, তার ফলে কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের কৃপার প্রভাবেই তাঁর প্রজারা কুমারদের অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

বৈণ্যস্তু ধুর্যো মহতাং সংস্থিত্যাধ্যাত্মশিক্ষয়া ।
আপ্তকামমিবাত্মানং মেন আত্মন্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈণ্যঃ—মহারাজ বেণের পুত্র (পৃথু); **তু**—নিঃসন্দেহে; **ধুর্যঃ**—প্রধান; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **সংস্থিত্যা**—পূর্ণরূপে স্থির হয়ে; **আধ্যাত্ম-শিক্ষয়া**—আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে; **আপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কামম্**—বাসনা; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—আত্মতৃপ্তিতে; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **আত্মনি**—আত্মায়; **অবস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে স্থির হওয়ার ফলে, মহাপুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করার ফলে, তিনি আত্মতৃপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হওয়ার ফলে, মানুষ পরম আত্মসন্তোষ লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মসন্তোষ কেবল শুদ্ধ ভক্তরাই লাভ করতে পারেন, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা থাকে না। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের কাম্য কিছুই নেই, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত। তেমনই, যে ভগবদ্ভক্তের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই, তিনিও ভগবানেরই মতো আত্মতৃপ্ত। সকলেই মনের শান্তি এবং আত্মার তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তা লাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে পৃথু মহারাজের অসীম জ্ঞান এবং পূর্ণ ভক্তির বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এখানে সমর্থিত হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত মহাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মাদের সম্বন্ধে বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পৃথানন্দন! মোহমুক্ত মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে সংরক্ষিত। তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, কারণ তাঁরা আমাকে আদি ও অব্যয় পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানেন।"

মহাত্মারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নন, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের দৈবী শক্তির সংরক্ষণে অবস্থিত। তার ফলে প্রকৃত মহাত্মারা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। পৃথু মহারাজ মহাত্মার এই সমস্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন, তাই এই শ্লোকে তাঁকে *ধুর্যো মহতাম্* বা শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫০

কর্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্ ।
যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্‌ব্রহ্মসাৎকৃতম্ ॥ ৫০ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **যথা-কালম্**—সময় ও পরিস্থিতির উপযুক্ত; **যথা-দেশম্**—স্থান ও স্থিতির উপযুক্ত; **যথা-বলম্**—নিজের শক্তি অনুসারে; **যথা-উচিতম্**—যতখানি সম্ভব; **যথা-বিত্তম্**—এই সম্বন্ধে যতখানি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব; **অকরোৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্রহ্ম-সাৎ**—পরম সত্যে; **কৃতম্**—করেছিলেন।

অনুবাদ

আত্মতুষ্ট হওয়ার ফলে পৃথু মহারাজ সময়, স্থান, শক্তি ও আর্থিক স্থিতি অনুসারে, যথাসম্ভব পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন দায়িত্বশীল সম্রাট, এবং তাই একই সময়ে তাঁকে একজন ক্ষত্রিয়, একজন রাজা এবং একজন ভক্তরূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছিল। সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে স্থান, কাল, আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুযায়ী, তিনি পূর্ণ দক্ষতা সহকারে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। এই সম্পর্কে এই শ্লোকে *কর্মাণি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ ছিল অসাধারণ, কারণ তা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তির অনুকূল যা কিছু তা কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুকূল কার্যকলাপকে কখনও সাধারণ কার্য বা সকাম কর্ম বলে মনে করা উচিত নয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, একজন সাধারণ কর্মী তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে। ভগবদ্ভক্ত সেই কার্য ঠিক একইভাবে সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। তাই তাঁর কার্যকলাপ সাধারণ নয়।

পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ সাধারণ ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল আধ্যাত্মিক ও দিব্য, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ঠিক অর্জুনের মতো, যিনি ছিলেন যোদ্ধা, তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য

যুদ্ধ করতে হয়েছিল। একজন রাজারূপে পৃথু মহারাজও ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর সম্রাটরূপে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা সর্বতোভাবে একজন শুদ্ধ ভক্তের উপযুক্ত ছিল। তাই জনৈক বৈষ্ণব কবি বলেছেন, '*বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়*'—শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ সাধারণ ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার পিছনে একটি গভীর বৈশিষ্ট্য থাকে—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে হলে, অত্যন্ত দক্ষ হতে হয়। যদিও একজন বৈষ্ণবরূপে পৃথু মহারাজ ছিলেন পরমহংস, অর্থাৎ সমস্ত জড় কার্যকলাপের অতীত, তবুও তিনি কখনও চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমের বাইরে কোন কার্য করেননি। একজন ক্ষত্রিয়রূপে তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের মাধ্যমে এই সমস্ত কার্যের অতীত ছিলেন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে, বাহ্যিকভাবে তিনি নিজেকে একজন অতি শক্তিশালী ও কর্তব্য-পরায়ণ রাজারূপে প্রকাশ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁর কোন কার্যই তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য করেননি। তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য নির্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ ।
কর্মাধ্যক্ষং চ মন্বান আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৫১ ॥

ফলম্—ফল; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **সংন্যস্য**—পরিত্যাগ করে; **নির্বিষঙ্গঃ**—কলুষিত না হয়ে; **সমাহিতঃ**—পূর্ণরূপে সমর্পিত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **অধ্যক্ষম্**—অধ্যক্ষ; **চ**—এবং; **মন্বানঃ**—সর্বদা চিন্তা করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরম্**—অতীত।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হয়েছিল, এবং তিনি সর্বদা নিজেকে সর্বেশ্বর ভগবানের দাসরূপে মনে করতেন।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় সমর্পিত পৃথু মহারাজের জীবন কর্মযোগের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। *ভগবদ্গীতায়* কর্মযোগ শব্দটির প্রায়ই ব্যবহার হয়েছে, এবং এখানে বাস্তবিকপক্ষে কর্মযোগ যে কি, তার ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়েছেন পৃথু মহারাজ। কর্মযোগের যথাযথ সম্পাদনে প্রাথমিক আবশ্যকতা এখানে দেওয়া হয়েছে। *ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য* (অথবা *বিন্যস্য*)—কর্মের সমস্ত ফল পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা করার ফলে, বাস্তবিকভাবে সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/২) বলা হয়েছে যে, কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানে অর্পণ করাকে বলা হয় সন্ন্যাস।

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন।" পৃথু মহারাজ যদিও একজন গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করছিলেন, তবুও তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

নির্বিষঙ্গঃ (নিষ্কলুষ) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পৃথু মহারাজ তাঁর কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। এই জড় জগতে কোন ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে এবং কার্য করে, সে সর্বদা নিজেদের তার মালিক বলে মনে করে। যখন কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদিত হয়, তখনই কেবল প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগের অনুশীলন হয়। কর্মযোগ যে-কেউ অনুশীলন করতে পারেন, তবে তা বিশেষভাবে গৃহস্থদের পক্ষে সহজ, যাঁরা তাঁদের গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিযোগের পন্থা অনুসারে তাঁর আরাধনা করতে পারেন। এই পন্থার নয়টি অঙ্গ রয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের এই পন্থা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। সেই সংঘের সদস্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার দ্বারা যে-কোন ব্যক্তি সেই পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

গৃহে অথবা মন্দিরে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সব কিছুর মালিক বলে মনে করা

উচিত, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করা উচিত। ভগবান এই জড় সৃষ্টির অংশ নন, তাই তিনি জড়াতীত। এই শ্লোকে *প্রকৃতেঃ পরম্* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু ভগবান স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি নন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় সৃষ্টির পরম অধ্যক্ষ, এবং সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কুন্তীপুত্র! এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় কার্য করছে, এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব উৎপন্ন করছে। সেই নিয়মের বশবর্তী হয়েই বার বার তার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিনাশ হচ্ছে।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় জড় পদার্থের আশ্চর্যজনক মিথস্ক্রিয়ার ফলে, জড় জগতের সমস্ত পরিবর্তন এবং প্রগতি সংঘটিত হচ্ছে। এই জড় জগতে কোন কিছুই ঘটনাচক্রে ঘটছে না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবক হয়ে সব কিছু তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ এই জড় জগতে জীবদ্দশাতেও তিনি মুক্ত। সাধারণত মুক্তিলাভ হয় দেহত্যাগের পর, কিন্তু যিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি এই জীবন-কালেই মুক্ত হয়ে যান। কৃষ্ণভক্তিতে কর্মের ফল নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। বাস্তবিকপক্ষে, কর্মের ফল নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। সেটি *ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য* উক্তিটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত আত্মার কখনও নিজেকে মালিক অথবা অধ্যক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধিবিধান অনুসারে তার কর্মের অনুষ্ঠান করা। তার কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর।

শ্লোক ৫২

গৃহেষু বর্তমানোঽপি স সাম্রাজ্যশ্রিয়ান্বিতঃ ।
নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ ॥ ৫২ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **বর্তমানঃ**—উপস্থিত; **অপি**—যদিও; **সঃ**—পৃথু মহারাজ; **সাম্রাজ্য**—সমগ্র রাজ্য; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত; **ন**—কখনই না; **অসজ্জতঃ**—আকৃষ্ট;

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **নিঃ**—না; **অহম্**—আমি; **মতিঃ**—বিবেচনা; **অর্ক**—সূর্য; **বৎ**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ, যিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি কখনও তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গৃহেষু* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থকেই স্ত্রীসঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তাই গৃহস্থ-আশ্রম হচ্ছে ভক্তদের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এক প্রকার অনুমতি। পৃথু মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যদিও তিনি গৃহস্থ হয়ে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারি ছিলেন, তবুও তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হননি। সেই বিশেষ লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন না, এবং তার ফলে তিনি মুক্ত। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ তাদের নিজেদের সন্তোষের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অথবা মুক্ত জীবনে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয় ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করা।

এই শ্লোকে পৃথু মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে *(অর্কবৎ)* তুলনা করা হয়েছে। সূর্য কখনও কখনও মল, মূত্র ও অন্যান্য দূষিত বস্তুর উপর কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু সূর্য যেহেতু সর্ব-শক্তিমান, তাই সেই সমস্ত দূষিত বস্তুর দ্বারা সূর্য কখনও প্রভাবিত হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্যকিরণ সমস্ত দূষিত ও নোংরা স্থান বিশুদ্ধ করে দেয়। তেমনই, ভক্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন বাসনা থাকে না, তাই তিনি কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, তাই তিনি কখনও জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পক্ষান্তরে, তাঁর দিব্য

পরিকল্পনার দ্বারা তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপকে চিন্ময় করে তোলেন। সেই কথা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক উপাধির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া।

শ্লোক ৫৩

এবমধ্যাত্মযোগেন কর্মাণ্যনুসমাচরন্ ।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চার্চিষ্যাত্মসম্মতান্ ॥ ৫৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **অধ্যাত্ম-যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **অনু**—সর্বদা; **সমাচরন্**—সম্পাদন করে; **পুত্রান্**—পুত্র; **উৎপাদয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **পঞ্চ**—পাঁচ; **অর্চিষি**—তাঁর পত্নী অর্চিতে; **আত্ম**—নিজের; **সম্মতান্**—তাঁর বাসনা অনুসারে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির মুক্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে, পৃথু মহারাজ কেবল ভগবৎ সেবারূপ কর্মই সম্পাদন করেননি, তাঁর পত্নী অর্চির গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে, তাঁর সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

একজন গৃহস্থরূপে পৃথু মহারাজ তাঁর পত্নী অর্চির মাধ্যমে পাঁচটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁদের প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের জন্ম ঘটনাক্রমে অথবা খামখেয়ালীর বশে হয়নি। বর্তমান যুগে (কলিযুগে) কিভাবে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সন্তান উৎপাদন করা যায়, তা এক প্রকার অজ্ঞাত। সেই রহস্যাবৃত পন্থাটি নির্ভর করে, পিতামাতার পবিত্রীকরণের জন্য নানা প্রকার সংস্কারের উপর। এই সমস্ত সংস্কারের মধ্যে প্রথম সংস্কারটি হচ্ছে গর্ভাধান সংস্কার বা সন্তান উৎপাদন করার সংস্কার। এই সংস্কারটি বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উচ্চবর্ণদের জন্য অবশ্য পালনীয়। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ধর্মনীতির অবিরুদ্ধ কাম হচ্ছে তিনি স্বয়ং, এবং ধর্মের নিয়মানুসারে কেউ যখন সন্তান উৎপাদন করতে চান, তখন মৈথুনের পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যৌন-মিলনের পূর্বে পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে

সন্তানের মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। কামের বশবর্তী হয়ে যখন সন্তান উৎপাদন হয়, তখন সেই সন্তান পিতামাতার বাসনা অনুসারে হয় না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *যথা যোনির্যথা বীজম্* । *যথা যোনিঃ* বলতে মাকে বোঝায় এবং *যথা বীজম্* পিতাকে বোঝায়। যৌন-মিলনের পূর্বে পিতামাতা যদি তাঁদের মনোভাব যথাযথভাবে গড়ে তোলেন, তা হলে তাঁদের যে সন্তান উৎপাদন হবে, সে অবশ্যই তাঁদের সেই মানসিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত করবে। তাই *আত্ম-সম্মতান্* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজ ও অর্চি উভয়েই সন্তান উৎপাদনের পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁদের সমস্ত সন্তানেরা তাঁদের ইচ্ছা এবং বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ কামের বশবর্তী হয়ে সন্তান উৎপাদন করেননি, এবং তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সন্তানদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শাসকরূপে উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৪

বিজিতাশ্বং ধূম্রকেশং হর্যক্ষং দ্রবিণং বৃকম্ ।
সর্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্গুণান্ ॥ ৫৪ ॥

বিজিতাশ্বম্—বিজিতাশ্ব নামক; **ধূম্রকেশম্**—ধূম্রকেশ নামক; **হর্যক্ষম্**—হর্যক্ষ নামক; **দ্রবিণম্**—দ্রবিণ নামক; **বৃকম্**—বৃক নামক; **সর্বেষাম্**—সকলের; **লোক-পালানাম্**—সমস্ত লোকের শাসক; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **একঃ**—এক; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **গুণান্**—সমস্ত গুণাবলী।

অনুবাদ

বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামক পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করার পরেও, পৃথু মহারাজ এই পৃথিবীর উপর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত লোকের শাসনকারী দেবতাদের সমস্ত গুণ তিনি ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি লোকে একজন শাসনকারী প্রধান দেবতা থাকেন। *ভগবদ্গীতা* থেকে জানা যায় যে, সূর্যলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন বিবস্বান। তেমনই, চন্দ্র আদি অন্যান্য প্রতিটি লোকে এক-একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্য

সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা হচ্ছেন সূর্য ও চন্দ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের বংশধর। এই পৃথিবীতেও দুটি ক্ষত্রিয়-বংশ রয়েছে, তাদের একটি আসছে সূর্যদেব থেকে এবং অন্যটি চন্দ্রদেব থেকে। সেই সূত্রে সেই বংশ দুটি যথাক্রমে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত। এই গ্রহে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন প্রধান শাসক ছিলেন সূর্যবংশের, এবং অধীনস্থ রাজারা ছিলেন চন্দ্রবংশের। কিন্তু পৃথু মহারাজ এত শক্তিশালী ছিলেন যে, অন্য সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান যুগে, মানুষ চন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা, তারা সেখানে কাউকেই দেখতে পায়নি। কিন্তু, বৈদিক শাস্ত্রে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্রলোক অতি উন্নত অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ, যাঁদের দেবতা বলে গণনা করা হয়। তাই এই পৃথিবীর আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে কি প্রকারে চন্দ্রলোক অভিযান করেছে, সেই সম্বন্ধে আমাদের সব সময় সন্দেহ রয়েছে।

শ্লোক ৫৫

গোপীথায় জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্বে স্বেঽচ্যুতাত্মকঃ ।
মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৫৫ ॥

গোপীথায়—সংরক্ষণের জন্য; **জগৎ-সৃষ্টেঃ**—পরম স্রষ্টার; **কালে**—যথাসময়ে; **স্বে স্বে**—নিজেদের; **অচ্যুত-আত্মকঃ**—কৃষ্ণভক্ত হওয়ায়; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাণী; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **সৌম্যৈঃ**—অত্যন্ত স্নিগ্ধ; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **সংরঞ্জয়ন্**—প্রসন্ন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—প্রজাদের।

অনুবাদ

যেহেতু পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত নাগরিকদের স্ব-স্ব বাসনা অনুসারে তাদের প্রসন্নতা-বিধান করার মাধ্যমে, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী, মন, কর্ম ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা সর্বতোভাবে তাদের প্রসন্ন রাখতেন।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, পৃথু মহারাজ অন্যদের মনোভাব বোঝার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা সব রকম নাগরিকদের প্রসন্ন রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর

আচরণ এত সুন্দর ছিল যে, সমস্ত নাগরিকেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতেন। এই শ্লোকে *অচ্যুতাত্মকঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পৃথু মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই পৃথিবী শাসন করতেন। তিনি জানতেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি এবং ভগবানের সৃষ্টিকে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা সহকারে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সৃষ্টির পিছনে যে কি উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না। চিৎ-জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ যদিও অত্যন্ত হেয়, তবুও এই জড় সৃষ্টির পিছনে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা সেই উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, এমন কি তারা একজন স্রষ্টার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে না। তারা তাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সব কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, এবং তারা পরম স্রষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু দর্শন করতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত। তিনি জানেন যে, জীবকে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই লোকের শাসকদের জানা উচিত যে, এখানকার সমস্ত অধিবাসীরা, বিশেষ করে মানুষেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে এসেছে। তাই শাসকের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের ইন্দ্রিয় সুখভোগের সুযোগ প্রদান করা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা, যাতে তাঁরা চরমে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

সেই উদ্দেশ্য মনে রেখে, রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের পৃথিবী শাসন করা উচিত। তার ফলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। তা সম্পাদন করা যায় কিভাবে? পৃথু মহারাজের মতো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যশাসনের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এমন কি এই অধঃপতিত যুগেও যদি শাসক, রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিরা পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্তের সুযোগ গ্রহণ করেন, তা হলে নিশ্চিতভাবে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির সাম্রাজ্য অবশ্যই স্থাপিত হবে।

শ্লোক ৫৬

রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ ।
সূর্যবদ্বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ প্রতপংশ্চ ভুবো বসু ॥ ৫৬ ॥

রাজা—রাজা; **ইতি**—এইভাবে; **অধাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **নামধেয়ম্**—নামক; **সোম-রাজঃ**—চন্দ্রলোকের রাজা; **ইব**—সদৃশ; **অপরঃ**—পক্ষান্তরে; **সূর্য-বৎ**—

সূর্যদেবের মতো; **বিসৃজন্**—বিতরণ করে; **গৃহ্ণন্**—আদায় করে; **প্রতপন্**—কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা; **চ**—ও; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বসু**—কর।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ চন্দ্রলোকের রাজা সোমরাজের মতো প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সূর্য যেমন তাপ ও আলোক বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে জল শোষণ করে, ঠিক তেমনই পৃথু মহারাজ কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে, যথাসময়ে তাদের তা দান করতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পৃথু মহারাজকে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহের রাজাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান যেভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা দেখতে চান, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন চন্দ্রগ্রহের রাজা এবং সূর্যগ্রহের রাজা। সূর্য তাপ ও কিরণ বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত গ্রহ থেকে জল শোষণ করে। রাত্রি বেলায় চন্দ্র অত্যন্ত মনোরম, এবং দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে কঠোর পরিশ্রম করার পর মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন রাত্রে সে চন্দ্রের কিরণ উপভোগ করে। সূর্যদেবের মতো পৃথু মহারাজ তাঁর তাপ ও কিরণ বিতরণ করে তাঁর রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, কারণ তাপ ও আলোক ব্যতীত কেউই থাকতে পারে না। তেমনই, পৃথু মহারাজ কর সংগ্রহ করেছিলেন এবং নাগরিক ও সরকারকে এমন কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে অবজ্ঞা করার শক্তি কারও ছিল না। অপর পক্ষে তিনি ঠিক চন্দ্রকিরণের মতো সকলের আনন্দ-বিধান করেছিলেন। সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই তাদের বিশেষ প্রভাবের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পালন করে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের পালন-কার্যে পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের অবগত হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫৭

দুর্ধর্ষস্তেজসেবাগ্নির্মহেন্দ্র ইব দুর্জয়ঃ ।
তিতিক্ষয়া ধরিত্রীব দ্যৌরিবাভীষ্টদো নৃণাম্ ॥ ৫৭ ॥

দুর্ধর্ষঃ—অজেয়; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মহা-ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **দুর্জয়ঃ**—অজেয়; **তিতিক্ষয়া**—সহিষ্ণুতার দ্বারা; **ধরিত্রী**—পৃথিবী; **ইব**—সদৃশ, **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **ইব**—সদৃশ; **অভীষ্ট-দঃ**—বাসনাপূর্ণকারী; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ এতই প্রবল এবং শক্তিমান ছিলেন যে, তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। তিনি ছিলেন অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দুর্জয় বলশালী। অপর পক্ষে, পৃথু মহারাজ আবার পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, এবং স্বর্গের মতো সকলের অভীষ্টপ্রদ ছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা এবং তাদের বাসনা পূর্ণ করা। সেই সঙ্গে আবার প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। পৃথু মহারাজ সৎ সরকারের সমস্ত মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন, এবং তিনি এমনই দুর্ধর্ষ ছিলেন যে, অগ্নির তাপ ও আলোক যেমন রোধ করা যায় না, তেমনই তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারও ছিল না। তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছিল। এই যুগের বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেক গবেষণা করছে, এবং পুরাকালে মানুষেরা ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু এই সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র ও আণবিক অস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিল। ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে বড় বড় পর্বতও বিদীর্ণ হয়। এত তেজস্বী ও বলবান হওয়া সত্ত্বেও পৃথু মহারাজ পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু, এবং আকাশ থেকে বর্ষার ধারার মতো তিনি প্রজাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন । বৃষ্টি ব্যতীত এই পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) বলা হয়েছে, *পর্জন্যাদ্ অন্ন-সম্ভবঃ*—আকাশ থেকে বৃষ্টি হয় বলেই কেবল অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং অন্ন না হলে এই পৃথিবীতে কেউই তৃপ্ত হতে পারে না। তেমনই অন্তহীন করুণা বিতরণের তুলনা করা হয় মেঘ থেকে বর্ষিত জলের সঙ্গে। পৃথু মহারাজ বর্ষার ধারার মতো নিরন্তর তাঁর কৃপা বিতরণ করতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথু মহারাজ ছিলেন গোলাপের থেকেও কোমল এবং বজ্রের থেকেও কঠোর। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্যশাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

বর্ষতি স্ম যথাকামং পর্জন্য ইব তর্পয়ন্ ।
সমুদ্র ইব দুর্বোধঃ সত্ত্বেনাচলরাড়িব ॥ ৫৮ ॥

বর্ষতি—বর্ষণ করে; **স্ম**—করে; **যথা-কামম্**—যত ইচ্ছা; **পর্জন্যঃ**—জল; **ইব**—সদৃশ; **তর্পয়ন্**—তৃপ্তিসাধন করে; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—সদৃশ; **দুর্বোধঃ**—দুর্বোধ্য; **সত্ত্বেন**—স্থিতির দ্বারা; **অচল**—পর্বত; **রাট্ ইব**—রাজার মতো।

অনুবাদ

মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে সকলের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনই পৃথু মহারাজ প্রজাদের অভাব মোচন করে তাদের সন্তোষ-বিধান করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো গম্ভীর এবং তাই তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না, এবং তাঁর সংকল্প ছিল পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজ দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের উপর তাঁর করুণা বিতরণ করতেন, এবং তা ছিল ঠিক প্রচণ্ড তাপের পর বারি বর্ষণের মতো। বিশাল সমুদ্র এতই গভীর যে, তা কেউ মাপতে পারে না; তেমনই পৃথু মহারাজ এতই গম্ভীর ছিলেন যে, তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না। মেরুপর্বত ব্রহ্মাণ্ডের আলের মতো স্থিত, এবং তার সেই স্থিতি থেকে একটুও নড়ানো যায় না; তেমনই পৃথু মহারাজের সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না।

শ্লোক ৫৯

ধর্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্যে হিমবানিব ।
কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা ॥ ৫৯ ॥

ধর্ম-রাট্ ইব—যমরাজের মতো; **শিক্ষায়াম্**—শিক্ষায়; **আশ্চর্যে**—ঐশ্বর্যে; **হিমবান্ ইব**—হিমালয় পর্বতের মতো; **কুবেরঃ**—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবের; **ইব**—সদৃশ; **কোশ-আঢ্যঃ**—ধনবান; **গুপ্ত-অর্থঃ**—গুপ্ত রহস্য; **বরুণঃ**—বরুণদেব; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা ছিল ঠিক যমরাজের মতো। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরত্ন ও ধাতু সঞ্চিত রয়েছে। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো, এবং গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ঠিক বরুণদেবের মতো।

তাৎপর্য

মৃত্যুর অধ্যক্ষ যমরাজ বা ধর্মরাজকে সারা জীবন পাপকর্মে লিপ্ত অপরাধী জীবদের বিচার করে দণ্ডদান করতে হয়। তার ফলে বিচারের ব্যাপারে যমরাজকে সব চাইতে দক্ষ বলে মনে করা হয়। পৃথু মহারাজও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং নাগরিকদের বিচারের ব্যাপারে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। হিমালয় পর্বতের খনিজ ও রত্নসম্ভারের মতো পৃথু মহারাজের ঐশ্বর্য ছিল অতুলনীয়; তাই স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনের রহস্য কেউই অবগত হতে পারত না, ঠিক যেমন জল, রাত্রি এবং পশ্চিম আকাশের অধিপতি বরুণদেবের রহস্য কেউই অবগত হতে পারে না। বরুণ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, এবং যেহেতু তিনি পাপের জন্য দণ্ডদান করেন, তাই ক্ষমা লাভের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। তিনি রোগ প্রেরণকারীও, এবং কখনও কখনও তাঁকে মিত্র ও ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

শ্লোক ৬০

মাতরিশ্বেব সর্বাত্মা বলেন মহসৌজসা ।
অবিষহ্যতয়া দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব ॥ ৬০ ॥

মাতরিশ্বা—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **সর্ব-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত; **বলেন**—দৈহিক শক্তির দ্বারা; **মহসা ওজসা**—সাহস ও শক্তির দ্বারা; **অবিষহ্যতয়া**—অসহিষ্ণুতার দ্বারা; **দেবঃ**—দেবতা; **ভগবান্**—সব চাইতে শক্তিশালী; **ভূত-রাট্ ইব**—রুদ্র বা সদাশিবের মতো।

অনুবাদ

দেহের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মহারাজ পৃথু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী। তাঁর অসহ্য বিক্রম ছিল শিব বা সদাশিবের অংশ সর্ব-শক্তিমান রুদ্রের মতো।

শ্লোক ৬১

কন্দর্প ইব সৌন্দর্যে মনস্বী মৃগরাড়িব ।
বাৎসল্যে মনুবন্নৃণাং প্রভুত্বে ভগবানজঃ ॥ ৬১ ॥

কন্দর্পঃ—কামদেব; **ইব**—সদৃশ; **সৌন্দর্যে**—সৌন্দর্যে; **মনস্বী**—চিন্তাশীলতায়; **মৃগ-রাট্ ইব**—পশুরাজ সিংহের মতো; **বাৎসল্যে**—স্নেহে; **মনু-বৎ**—স্বায়ম্ভুব মনুর মতো; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **প্রভুত্বে**—নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে; **ভগবান্**—প্রভু; **অজঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন কন্দর্পের মতো, এবং তিনি ছিলেন সিংহের মতো নির্ভীক। বাৎসল্যে তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর মতো, এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল ব্রহ্মার মতো।

শ্লোক ৬২

বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মবত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ ।
ভক্ত্যা গোগুরুবিপ্রেষু বিষ্বক্সেনানুবর্তিষু ।
হ্রিয়া প্রশ্রয়শীলাভ্যামাত্মতুল্যঃ পরোদ্যমে ॥ ৬২ ॥

বৃহস্পতিঃ—স্বর্গের পুরোহিত বৃহস্পতি; **ব্রহ্ম-বাদে**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে; **আত্ম-বত্ত্বে**—আত্ম-সংযমের ব্যাপারে; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্ত্যা**—ভক্তিতে; **গো**—গাভী; **গুরু**—গুরুদেব; **বিপ্রেষু**—ব্রাহ্মণদের; **বিষ্বক্সেন**—ভগবান; **অনুবর্তিষু**—অনুগামী; **হ্রিয়া**—লজ্জার দ্বারা; **প্রশ্রয়-শীলাভ্যাম্**—অত্যন্ত ভদ্র আচরণের দ্বারা; **আত্ম-তুল্যঃ**—ঠিক নিজের মতো; **পর-উদ্যমে**—পরোপকারের কার্যে।

অনুবাদ

তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে পৃথু মহারাজ সমস্ত সৎ গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন, এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল ঠিক বৃহস্পতির মতো। আত্ম-সংযমে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের মতো। ভক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাভী, গুরু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি আসক্ত ভক্তদের মহান অনুগামী। তিনি ছিলেন লজ্জাশীল এবং তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনম্র। আর পরোপকারের জন্য তিনি এমনভাবে কার্য করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে কার্য করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁকে বৃহস্পতির অবতার বলে সম্বোধন করেছিলেন। বৃহস্পতি হচ্ছেন

স্বর্গলোকের প্রধান পুরোহিত, এবং তিনি ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ দর্শনের অনুগামী। বৃহস্পতি একজন মহান নৈয়ায়িক। এই উক্তি থেকে প্রতীত হয় যে, পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত একজন মহান ভক্ত, তবুও তিনি বৈদিক শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত নির্বিশেষবাদী ও মায়াবাদীদের পরাস্ত করতে পারতেন। পৃথু মহারাজের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকেন না, প্রয়োজন হলে ন্যায় ও দর্শনের ভিত্তিতে নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীদের সঙ্গে তর্ক করে তাদের নির্বিশেষবাদকে পরাস্ত করতে প্রস্তুত থাকেন।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আদর্শ আত্মসংযমী বা ব্রহ্মচারী। শ্রীকৃষ্ণকে যখন যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে সভাপতিরূপে মনোনীত করা হয়েছিল, তখন পিতামহ ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী বলে প্রশংসা করেছিলেন। যেহেতু পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন ব্রহ্মচারী, তাই ব্রহ্মচারী ও ব্যভিচারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে তিনি সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিলেন। পৃথু মহারাজ যদিও ছিলেন গৃহস্থ এবং পাঁচটি সন্তানের পিতা, তবুও তাঁকে পরম আত্মসংযমী বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। কেউ যখন মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারী। যারা কুকুর-বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, তারা উপযুক্ত পিতা নয়। ব্রহ্মচারী শব্দটি ব্রহ্মস্তরে আচরণকারী বা ভগবদ্ভক্তির আচরণকারী ব্যক্তিদেরও বোঝায়। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণায় কোন রকম ক্রিয়া নেই, কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে কার্য করেন, তখন তাঁকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। এইভাবে পৃথু মহারাজ একাধারে একজন আদর্শ ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ছিলেন। *বিষ্বক্সেনানুবর্তিষু* শব্দটি সেই ভক্তদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত। অন্য ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস* । যাঁরা ষড় গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি তাঁদের শিষ্য হতে প্রস্তুত।

সমস্ত বৈষ্ণবদের মতো পৃথু মহারাজও গোরক্ষা, গুরুদেব ও যোগ্য ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পৃথু মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত বিনীত, সুশীল ও ভদ্র, এবং যখনই তিনি জনসাধারণের জন্য কোনরকম পরোপকারের কার্য অথবা কল্যাণকর কার্য করতেন, তখন তিনি এমনভাবে পরিশ্রম করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সেই কাজ করছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি কেবল লোক-দেখানোর জন্য পরোপকারের কার্য করতেন না, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং নিষ্ঠা সহকারে তা করতেন। সমস্ত পরোপকারের কার্য এইভাবে করা উচিত।

শ্লোক ৬৩

কীর্ত্যোর্ধ্বগীতয়া পুম্ভিস্ত্রৈলোক্যে তত্র তত্র হ ।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥ ৬৩ ॥

কীর্ত্যা—কীর্তির দ্বারা; **উর্ধ্ব-গীতয়া**—উচ্চস্বরে কীর্তনের দ্বারা; **পুম্ভিঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **ত্রৈ-লোক্যে**—সারা ব্রহ্মাণ্ডে; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **কর্ণ-রন্ধ্রেষু**—কর্ণকুহরে; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **রামঃ**—শ্রীরামচন্দ্র; **সতাম্**—ভক্তদের; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী লোকের সর্বত্র পৃথু মহারাজের যশ উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়েছিল, এবং সমস্ত স্ত্রী ও সাধুরা তাঁর মহিমা শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তির মতোই মধুর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *স্ত্রীণাম্* ও *রামঃ* শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রীলোকেরা বীরদের প্রশংসা শুনে আনন্দ উপভোগ করেন। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, পৃথু মহারাজের খ্যাতি এতই মহান ছিল যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র স্ত্রীলোকেরা গভীর আনন্দের সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর মহিমা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভগবদ্ভক্তেরাও শ্রবণ করেছিলেন, এবং তাঁদের কাছে তা ঠিক শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার মতোই আনন্দদায়ক ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য এখনও বর্তমান, এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষে রামরাজ্য পার্টি নামক একটি রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছে, যা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা রামকে বাদ দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদিও তারা ভগবৎ-চেতনা বর্জন করেছে, তবুও তারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভগবদ্ভক্তরা এই প্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পৃথু মহারাজের মহিমা সাধুরা শ্রবণ করেছিলেন, কারণ তিনি আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।